HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সামাজিক ব্যবস্থা

টপিক – ০১ সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা
টপিক ০২: অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সম্পত্তি
টপিক ০৩: রাষ্ট্রের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৪: রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ
টপিক ০৫: ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব
টপিক ০৬: ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পারস্পারিক সম্পর্ক
টপিক ০৭: শিক্ষার ধারণা
টপিক ০৮: শিক্ষার স্তর
টপিক ০৯: শিক্ষার ভূমিকা ও কার্যাবলী
টপিক ১০: শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ
টপিক ১১: ধর্মের ধারণা
টপিক ১২: নৈতিকতার ধারণা ও প্রভাব

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১৩: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ১৪: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা

সমাজ একটি শাশ্বত ও সর্বজনীন মানব সংগঠন। এটি হচ্ছে মানুষের এমন একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়া যা পরস্পরের সম্পর্ক, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা ও পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকে। সমাজকে ঘিরেই মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন এবং যাবতীয় প্রয়োজন মিটে। নদীর প্রবাহমান স্রোতের মতোই সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনশীল সমাজের মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন।

সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা

প্রতিটি সমাজেরই রয়েছে একটি নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সমাজের এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সম্পত্তির মালিকানা, উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, সঞ্চয়, লগ্নির ইত্যাদি বিষয়। অনুরূপভাবে প্রতিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পিছনে রয়েছে এক বা একাধিক রাজনৈতিক দর্শন। এ রাজনৈতিক দর্শনগুলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নীতিনির্ধারক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সেদেশের প্রতিষ্ঠানগত ও আইনগত কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগত ও আইনগত কাঠামোকে বলা হয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রধানত ৪ ধরনের অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে- পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, মিশ্র এবং ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা

অর্থনীতিবিদ জি. গ্রোসম্যান-এর ভাষায়, "The set of institutions that characterizes a given economy comprises its economic system." মানুষ যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করে তা দ্বারাই মানুষের সব অর্থনৈতিক কার্যাবলি তথা উৎপাদন, ভোগ, বিনিময়, বণ্টন প্রভৃতির প্রকৃতি ও পদ্ধতি নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজে মানুষের সম্পত্তির অধিকার, উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি বিষয়ে অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদনে যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়।

সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা

ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা

পুঁজিবাদ বা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এমন একটি অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে এবং সমাজের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংঘটিত হয়। এ ব্যবস্থায় মূল প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে অবাধে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন এবং ভোগকার্য চলে। এ অর্থব্যবস্থায় ক্রেতা ও ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় থাকে এবং ভোগকারীর ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী উৎপাদন করা হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ভিত্তি হলো অবাধ প্রতিযোগিতা। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ থাকে না; বরং একটি স্বয়ংক্রিয় মূল্য ব্যবস্থার মাধ্যমেই সবকিছু নির্ধারিত হয়। এজন্য ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে 'স্বাধীন উদ্যোগের অর্থনীতি'ও বলা হয়।

সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা

ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা

অধ্যাপক ডি. এম. বাইট-এর মতে, "পুঁজিবাদ এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তির কাজ বিশেষ করে নতুন বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত হয় এবং তা অবাধ প্রতিযোগিতা ও মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।"

ম্যাক্স ওয়েবার বলেন, "পুঁজিবাদ হলো বাজার ব্যবস্থার সাথে বাঁধা একটি মুনাফা তৈরির ব্যাপার যা বিভিন্ন দেশে একাধিকরূপে বিকল্পিত হয়েছে।"

অতএব বলা যায়, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের ওপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত, অর্থনৈতিক কার্যক্রম সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং উৎপাদনের উপকরণ ও দ্রব্যের বাজারে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকে তাকে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়। পুঁজিবাদে মালিকের সাথে শ্রমিকের শোষণের সম্পর্ক লক্ষ করা যায়।

সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এমন এক ধরনের অর্থব্যবস্থা যেখানে সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে অর্থনৈতিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণের ওপর কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না। দেশের যাবতীয় সম্পদ এবং উৎপাদনের উপকরণের ওপর সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে দেশের কলকারখানা, খনি, জমি প্রভৃতি সামাজিক সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। দেশের জনগণ বা রাষ্ট্র এসব সম্পদের মালিক। এর লক্ষ্য হলো সকলের কল্যাণ সাধন করা। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফার কোনো সুযোগ নেই। দেশের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, ভোগ প্রভৃতি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থাও বলা হয়। এখানে উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টন ও ভোগের ওপর ভোক্তার স্বাধীনতা স্বীকৃত নয়। দাম নির্ধারণে বাজার ব্যবস্থার কোনো প্রভাব নেই। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষই সিদ্ধান্ত নেবে কী উৎপাদন করতে হবে, কেমন করে, কার জন্য উৎপাদন করতে হবে। প্রত্যেক শ্রমিক নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে। রাশিয়া, চীন এবং পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত।

সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

অধ্যাপক ডিকেনসন বলেন, "সমাজতন্ত্র হলো এমন একটি অর্থনৈতিক সংগঠন যেখানে উৎপাদনের উপকরণগুলো সমাজের হাতে থাকে, পরিকল্পনা দ্বারা উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় এবং এ ধরনের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত উৎপাদনের উপকারিতা সমাজের প্রতিটি সদস্যই ভোগ করে থাকে।"

এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা-তে বলা হয়েছে, "সাম্যবাদী ব্যবস্থার লক্ষ্যে বর্তমান ব্যবস্থার তুলনায় অধিকতর সুষ্ঠু উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোনো কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষ জনগণের যথাযথ আনুগত্যের ওপর ভিত্তিশীল যে পলিসি অবলম্বন করে তা-ই সমাজতন্ত্র।"

অতএব, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থায় কোনো ব্যক্তিমালিকানা নেই এবং সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা

মিশ্র অর্থনীতি বা মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

মিশ্র অর্থব্যবস্থা হলো এমন এক ধরনের অর্থব্যবস্থা, যেখানে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ই স্বীকৃত হয়ে থাকে। এ অর্থব্যবস্থায় সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ অবস্থান করে। এ অর্থব্যবস্থায় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটে। এ অর্থব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের মতো সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা, মুনাফা অর্জন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে। জনকল্যাণ ও জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক কিছু খাত রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে এবং অন্যান্য উৎপাদন ও সেবাখাতগুলো ব্যক্তিমালিকানায় থাকে। বিশ্বের বহু দেশেই গ্যাস, বিদ্যুৎ, প্রতিরক্ষা শিল্প রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রেখেছে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্যের সাথে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কিছু বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণে যে স্বতন্ত্র একটি অর্থব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাকে মিশ্র অর্থনীতি বলা হয়।

সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা

মিশ্র অর্থনীতি বা মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

অধ্যাপক স্যামুয়েলসন-এর মতে, "মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন একটি অর্থনৈতিক কাঠামো যেখানে উৎপাদন ও ভোগকর্ম সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার সাথে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটে থাকে।"

অতএব, ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণে যে অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং যেখানে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের উদ্যোগই বিরাজ করছে এবং সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে কিংবা পাশাপাশি থেকে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা হলে তাকে মিশ্র অর্থনীতি বলা হয়। বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা

ইসলামি অর্থব্যবস্থা

অধ্যাপক শামসুল আলম-এর মতে, "সৃষ্ট জীবের কল্যাণের জন্য সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন, সুষম বণ্টন এবং ন্যায়সংগত ভোগ-বিশ্লেষণই হলো ইসলামি অর্থব্যবস্থা।"

ড. সাবাহ ইলদিন জাইম বলেন, "ইসলামি অর্থনীতি বলতে ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার আচরণের সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ ও অধ্যয়নকে বোঝায়।"

সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন-এর মতে, "ইসলামি অর্থনীতি হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞানের নাম।"

ইসলামি অর্থব্যবস্থা ভোগের সীমাহীন স্বাধীনতা বা নিরঙ্কুশ কোনোটিই সমর্থন করে না বরং এ ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে। ব্যক্তিসত্তার বিকাশের স্বার্থে ইসলাম যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে তেমনি সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ইসলামি অর্থনীতিতে কিছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সামাজিক ব্যবস্থা

টপিক – ০২ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সম্পত্তি

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সম্পত্তি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সম্পত্তি

সম্পত্তির ধারণা

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন কার্যকলাপের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সম্পত্তি। সম্পত্তি বলতে কোনো দ্রব্য, বিষয় বা বস্তু ভোগদখল এবং নিয়ন্ত্রণ করার সমাজ স্বীকৃত নিরঙ্কুশ অধিকারকে বোঝায়। যখন কোনো বিষয় বা বস্তুর ওপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সমাজ স্বীকৃত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে এবং সে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার সাথে কতকগুলো অধিকার ও কর্তব্যবোধ জড়িত থাকে তখন তাকে সম্পত্তি বলে। সমাজ অনুমোদিত পন্থায় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্পত্তি ভোগদখল করবে অন্য কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

এল. টি. হবহাউস (L. T. Hobhouse) সম্পত্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "সম্পত্তি বলতে কোনো জিনিসের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে বোঝায়। এটি এমন একটি নিয়ন্ত্রণ যা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত, নিয়ন্ত্রণের এ ক্ষমতা মোটামুটিভাবে স্থায়ী এবং চূড়ান্ত।"

উইলিয়াম পি. স্কট (William P. Scott) তার 'Dictionary of Sociology' গ্রন্থে Property-এর সংজ্ঞায় লিখেছেন, "সম্পত্তি হচ্ছে কোনো বস্তু, সম্পদ বা কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন সব অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং দায়িত্ব, যা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। অর্থাৎ সম্পত্তি হচ্ছে সমাজ স্বীকৃত অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং দায়িত্বের সমাহার, যা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সামাজিক অনুমোদনের মাধ্যমে লাভ করে।" সম্পত্তির ধারণা থেকে এর তিনটি উপাদান সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যথা- ১. কোনো বিষয় বা বস্তু, ২. মালিকানা এবং ৩. সামাজিক অনুমোদন।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সম্পত্তি

সম্পত্তির ধারণা

অ্যারিস্টটল (Aristotle) সম্পত্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার লেখায় সম্পত্তির ৩টি প্রকৃতি তুলে ধরেন-

i. ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Private Property);

ii. রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি (State Property) ও

iii. সাধারণ সম্পত্তি (Common Property) ।

জিন্সবার্গ (Ginsberg)-এর মতে, "Property is a set of rights and obligation which defines the relation between individuals or groups in respect of their control over material things." (বস্তু বা সামগ্রীর ওপর কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একচ্ছত্র আধিপত্যকেই সম্পত্তি বলে)।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সম্পত্তি

সম্পত্তির ধারণা

International Encyclopedia of Social Science (Vol. 12; P-590)-এ সম্পত্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, সম্পত্তি এমন একটি ধারণা, যা সীমাবদ্ধ কোনো সামাজিক মূল্যের প্রতি মানুষের অধিকার, আইনগত বৈধতা, ভোগের নিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তা যা উক্ত সমাজের মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অধ্যাপক আর. এম. ম্যাকাইভার (R. M. MacIver) সম্পদ নিয়ন্ত্রণ, ব্যবহার বা ভোগের অধিকারের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন, সম্পত্তি বলতে কোনো জিনিসের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে বোঝায়। যা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এবং নিয়ন্ত্রণের এ ক্ষমতা মোটামুটিভাবে স্থায়ী ও চূড়ান্ত।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সম্পত্তি

সম্পত্তির ধারণা

কিংসলে ডেভিস (Kingsley Davis)-এর মতে, Property is nothing more than rights and obligations with respeat to something search. (সম্পত্তি সীমিত কোনো বিষয়ে মানুষের অধিকার এবং আইনগত বৈধতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।)

International Encyclopedia of Social Science-এ বলা হয়েছে, "সম্পত্তি এমন একটি প্রত্যয়, যা সীমাবদ্ধ কোনো সামাজিক মূল্যের প্রতি মানুষের অধিকার, আইনগত বৈধতা, ভোগের নিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তা-যা, ওই সমাজের মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ 'করে।" সম্পত্তির উপরিউক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণে সম্পত্তির চারটি উপাদান লক্ষ করা যায়। যথা- (ক) উপযোগ, (খ) বস্তু বা বিষয়, (গ) নিরঙ্কুশ মালিকানা, (ঘ) সামাজিক অনুমোদন বা স্বীকৃতি।

মোটকথা, সম্পত্তি বলতে বোঝায় কোনোকিছুর মালিকানা এবং এর ওপর নিরঙ্কুশ অধিকারকে। মানুষ যা নিজের সামর্থ্যে অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে কোনোকিছু অর্জন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তাই তার সম্পত্তি বলে আধুনিক চিন্তাবিদগণ মনে করেন।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সম্পত্তি

সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য

সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিস (Kinsley Davis) তার 'Human Society' গ্রন্থে সম্পত্তির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন—

- সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য;
- সম্পত্তির অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ পৃথকীকরণ;
- সম্পত্তি ক্ষমতার প্রতীক;
- সম্পত্তির বাহ্যিক ও গুণগত প্রকৃতি বিদ্যমান;
- সম্পত্তির মালিকানা ও দখলের পার্থক্য;
- সম্পত্তির ধারণা ও মূল্যমান সীমিত ও
- সম্পত্তির আনুষ্ঠানিক বা সামাজিক প্রথা স্বীকৃত;
- সম্পত্তি চলমান;
- সম্পত্তির উপযোগিতা ও বিনিময়মূল্য স্বীকৃত ।
- সম্পত্তি হলো কোনো বিষয়ের ওপর নিরঙ্কুশ মালিকানা ।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সম্পত্তি

সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য

সম্পত্তির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এর কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

১. মালিকানা,
২. ইচ্ছাধীন ব্যবহার,
৩. চূড়ান্ত মালিকানা অধিকার,
৪. স্থায়িত্ব,
৫. হস্তান্তর ও
৬. সামাজিক স্বীকৃতি।

অতএব বলা যায়, সম্পত্তি হচ্ছে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সমাজের মানুষ বিভিন্ন বিপদ-আপদ মোকাবিলা করতে পারে। সম্পত্তি বিভিন্ন ধরনের মালিকানায় থাকতে পারে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সম্পত্তি

সম্পত্তির মালিকানা

বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপযোগের ওপর স্বীয় অধিকার স্থাপনের মাধ্যমে মানুষের মনে সম্পত্তির মালিকানার ধারণা জন্মায়। সম্পত্তির মালিকানাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-

• সমষ্টিগত মালিকানা : সাধারণত সমাজতান্ত্রিক সমাজে সমষ্টিগত মালিকানা বিদ্যমান। এ সমাজে কৃষিজমি, শিল্পকারখানা ইত্যাদি উৎপাদনের যন্ত্রগুলো বা উৎপাদনের উপকরণসমূহ সামাজিক মালিকানায় পরিচালিত হয়। আমাদের সমাজে কিছু শিল্প ও প্রতিষ্ঠান সামাজিক মালিকানায় বা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রয়েছে। যেকোনো জাতীয় সম্পদ বা সম্পত্তি হলো Public Property বা জনগণের সম্পত্তি। বস্তুত জনগণের সম্পত্তি সমাজ বা রাষ্ট্রের মালিকানায় পরিচালিত হয় ।

• যৌথ পারিবারিক মালিকানা : আমাদের সমাজে এমন সম্পত্তি রয়েছে যার মালিকানা পরিবারের হাতে ন্যস্ত। পরিবারের সব সদস্যই এ সম্পত্তির মালিক। সাধারণত পরিবারের কর্তা ব্যক্তি কিংবা স্বামী বা স্ত্রী জমিজমা ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিক, তথাপি পরিবারের সবাই সেগুলো ভোগ করার অধিকার রাখে। পরিবারের কর্তাব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের সে অধিকার প্রদান করে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সম্পত্তি

সম্পত্তির মালিকানা

· ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহার্য দ্রব্যের মালিকানা : আমরা জানি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে সাধারণত উৎপাদন কাজে অথবা বাড়তি আয়ের কাজে ব্যবহার বা লগ্নি করা যায় এমন সম্পত্তিকে বোঝায়। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি বলতে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যবহার্য দ্রব্য; যেমন— তার পোশাক, কলম, ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি দ্রব্যকে বোঝায়। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি সাধারণত বাড়তি উৎপাদন বা বাড়তি আয়ে তেমন ভূমিকা পালন করে না । দেশ-কাল-পাত্রভেদে সম্পত্তির ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। তবে সম্পত্তির শ্রেণিভেদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে তিনটি মূল বিষয় বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। এ তিনটি বিষয় হলো-

ক. সম্পত্তির মালিকের সংখ্যা।

খ. মালিকের স্বত্ব স্থায়িত্বের বা অধিকারের প্রকৃতি

গ. সম্পত্তির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সম্পত্তি

সম্পত্তির মালিকানা

কিংসলে ডেভিসের মতে, যেসব সম্পত্তির অধিকার ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীর মালিকানার অন্তর্ভুক্ত এবং যা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার অধিকারী তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা-

ক. ব্যক্তিবিশেষের অধিকারভুক্ত ও খ. গোষ্ঠীবিশেষের অধিকারভুক্ত।

ক. ব্যক্তিবিশেষের অধিকারভুক্ত: যেসব সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির নিজস্ব অধিকার আছে এবং যা সমাজ স্বীকৃত সেটিই ব্যক্তিবিশেষের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- বাড়ি, গাড়ি, উপার্জিত অর্থ, স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ইত্যাদি।

খ. গোষ্ঠীবিশেষের অধিকারভুক্ত: যেসব সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির একার কোনো অধিকার নেই এবং যা সমাজ স্বীকৃত সেটিই গোষ্ঠীবিশেষের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতাল ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সম্পত্তি

সম্পত্তির মালিকানা

কিংসলে ডেভিসের মতে, যেসব অধিকারের মালিক জনসাধারণ এবং তাদের প্রভু হিসেবে ব্যক্তিবিশেষের বা গোষ্ঠী বা সরকারি সংস্থা সেই অধিকার প্রয়োগ করেন তাকে সাধারণ সম্পত্তি বলা যায়। সাধারণ সম্পত্তিও দুই ভাগে বিভক্ত। যথা-

ক. জনসাধারণের সম্পত্তি: কয়েক প্রকার সম্পত্তি আছে যাকে জনসাধারণের সম্পত্তি বলা যায়। যেমন- আদিম সমাজে কৃষিভূমি, বর্তমান সমাজে নদনদী, রাস্তাঘাট, নানাপ্রকার সাধারণের উপভোগ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

খ. সরকারি সম্পত্তি: সরকারি সম্পত্তি হলো যা সরকারি ব্যয়ে নির্মিত বা সংগৃহীত, সরকারি প্রয়োজনে নিযুক্ত বা সরকারি কর্তৃত্বাধীন, যার ওপর জনসাধারণের কোনো কর্তৃত্ব নেই, কিন্তু যা জাতীয় সম্পত্তিরই একাংশ জনসাধারণের নিকট হতে লব্ধ (যেমন- রাজকর বাবদ) অর্থব্যয়ে সরকারের আইনসংগত অধিকারভুক্ত হয়েছে। সরকারি সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ফ্লাইওভার, কর্ণফুলি টানেল, মেট্রোরেল ইত্যাদি। সম্পত্তির মালিকানা ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক, সরকারি এবং গোষ্ঠীগত বা সমষ্টিগত হতে পারে। সম্পত্তির মূল প্রয়োজন অর্থনৈতিক হলেও এর উপভোগ সমাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সামাজিক ব্যবস্থা

টপিক – ০৩ রাষ্ট্রের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

রাষ্ট্রের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রের ধারণা

রাষ্ট্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও বটে। নাগরিকের সুসভ্য, সুন্দর জীবনযাপনের জন্য রাষ্ট্র অপরিহার্য। আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো রাষ্ট্রে বসবাস করি। রাষ্ট্র ছাড়া মানুষের পক্ষে সুসংগঠিত ও সুন্দর জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। উন্নততর ও উত্তম জীবনযাপনের জন্য রাষ্ট্রীয় সংস্থার উদ্ভব হয়েছে।

যে রাজনৈতিক সংগঠনের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সুসংগঠিত সরকার, সার্বভৌম আধিপত্য ও স্থায়িভাবে বসবাসকারী কম বা বেশি জনসমষ্টি আছে তাকে রাষ্ট্র বলে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "কতিপয় গ্রাম ও পরিবারের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত। পূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।"

অধ্যাপক ম্যাকাইভারের মতে, "রাষ্ট্র এমন একটি সংঘ যা সরকার ঘোষিত আইন অনুসারে কাজ করে।"

উড্রো উইলসন রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত একটি জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলে।"

সমাজবিজ্ঞানী পিতিরিম সরোকিন (Sorokin)-এর মতে, রাষ্ট্র হলো তার কর্তৃত্বাধীন জনগণের সকল গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্বন্ধ তত্ত্বাবধান ও চাপ প্রশাসনের সংগঠন।

রাষ্ট্রের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রের ধারণা

বার্জেসের মতে, "মানবজাতির কোনো অংশ সংঘবদ্ধভাবে বাস করলে রাষ্ট্র গঠিত হয়।"

রবার্টসন (Robertson) বলেন, "রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বৈধভাবে ক্ষমতা ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে।"

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অধ্যাপক লাস্কি বলেন, এমন একটি ভূখণ্ডভিত্তিক সমাজ যা সরকার এবং শাসিত জনগণের মধ্যে বিভক্ত এবং যা এর নিজস্ব ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে অবস্থিত অন্য সকল সংস্থার ওপর প্রাধান্য দাবি করে।

সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন ও নিমকফ বলেন, রাষ্ট্র হলো একটি সংগঠন যা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সার্বভৌম সরকার কর্তৃক শাসিত।

রাষ্ট্রের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন অধ্যাপক গার্নার। তার মতে, "রাষ্ট্র এমন এক জনসমষ্টি যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাস করে, যারা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং যাদের একটি সুসংগঠিত সরকার আছে- যার প্রতি জনসাধারণ স্বভাবতই আনুগত্য স্বীকার করে।"

ব্লন্টস্টিস রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন, "এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজই রাষ্ট্র।"

অতএব বলা যায়, রাষ্ট্র সে জনসমষ্টি যারা কোনো এক ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাস করে, একটি সংগঠিত সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে এবং সর্বপ্রকার বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে।

রাষ্ট্রের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রের উপাদান

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদান বা বৈশিষ্ট্য প্রতিয়মান হয়। এগুলো হলো- ১. জনসমষ্টি, ২. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, ৩. সরকার ও ৪. সার্বভৌমত্ব। এ চারটি বৈশিষ্ট্যের একত্র সমাবেশ ঘটলেই একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রের এ চারটি বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো-

১. জনসমষ্টি: রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনসমষ্টি একটি অপরিহার্য উপাদান। জনসংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে। যেমন-গণচীনের জনসংখ্যা একশ ত্রিশ কোটির ওপর। পক্ষান্তরে, ব্রুনাইয়ের জনসংখ্যা প্রায় দুই লাখের মতো। অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রশাসন ও উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনার জন্য চলনসই জনসমষ্টি থাকলেই রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে।

২. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড: নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রাষ্ট্রের দ্বিতীয় উপাদান। অবশ্য ভূখণ্ড ছোট বা বড় হতে পারে। যেমন-মোনাবেগর আয়তন মাত্র ২.৫ বর্গকিলোমিটার। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। ভূখণ্ড বলতে একটি রাষ্ট্রের স্থলভাগ, জলভাগ এবং এর আকাশসীমাকে বোঝায়।

রাষ্ট্রের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রের উপাদান

৩. সরকার: সরকার রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা সরকারের মাধ্যমে প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হয়। রাষ্ট্রের যাবতীয় শাসনকার্য সরকারই পরিচালনা করে। তবে রাষ্ট্রভেদে সরকার বিভিন্নরূপ হতে পারে। যেমন- সংসদীয় সরকার, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ইত্যাদি।

৪. সার্বভৌমত্ব: সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা। এর দুটি দিক আছে। যথা- অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ও বাহ্যিক ক্ষমতা। অভ্যন্তরীণ ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র তার মধ্যস্থিত সকল ব্যক্তির, সংস্থার ওপর খবরদারি করে, আদেশ ও নিষেধ জারি করে। আর বাহ্যিক চরম ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে।

রাষ্ট্রের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রের উপাদান

উপরে বর্ণিত চারটি উপাদান বিশ্লেষণ করলে আধুনিক রাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা-

রাষ্ট্র মোটামুটি স্থায়ী। সরকারের পরিবর্তন হলেও সাধারণত রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় না। রাষ্ট্রের আয়তন ছোটবড় হতে পারে, কিন্তু বিলীন হয় না।

আধুনিককালে 'স্বীকৃতি' রাষ্ট্রের একটি বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য। কারণ স্বীকৃতি ছাড়া রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক মর্যাদা পায় না।

সাম্য রাষ্ট্রের একটি বৈশিষ্ট্য।

যেকোনো রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি, বাণিজ্য ইত্যাদি করার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে পূর্ণভাবে স্বাধীন হতে হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সামাজিক ব্যবস্থা

টপিক – ০৪ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

কখন, কীভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে তার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ বা দলিল নেই। তাই বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ নিজস্ব অবস্থান থেকে নানাভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা ও মতবাদ প্রদান করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে চারটি প্রধান মতবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো- ১. বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ; ২. বলপ্রয়োগ মতবাদ; ৩. সামাজিক চুক্তি মতবাদ এবং ৪. ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

ঐশ্বরিক মতবাদ

ঐশ্বরিক মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রাচীনতম মতবাদ। এ মত অনুযায়ী রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি। রাজা বিধাতার প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র শাসন করেন। সুতরাং রাজার আদেশ পালন করার অর্থ বিধাতার নির্দেশ মেনে চলা। রাজার আদেশ-নির্দেশ অমান্য করা গর্হিত পাপ। শাসকরা তাদের কোনো কাজের জন্য জনসাধারণের কাছে দায়ী নন; বরং তারা তাদের কাজের জন্য বিধাতার কাছে দায়ী। তারা ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে জনসাধারণের ওপর চরম ক্ষমতার অধিকারী। রাজা শুধু রাষ্ট্রপ্রধানই নন, তিনি ধর্মনায়কও বটে। এ মতবাদের মূলকথা এই যে, বিধাতা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন এবং রাজা তার প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র শাসন করেন। রাজা জনসাধারণের কাছে কোনোক্রমেই দায়ী নন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

ঐশ্বরিক মতবাদ

প্রাচীনকালে এ মতবাদ সমর্থিত হতো। অতীতে ইহুদিরা এ মতবাদ প্রচার করত। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতে এর সমর্থন মেলে। 'Old Testament' ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, ঈশ্বর রাজাকে মনোনয়ন দান করেছেন। "দৈবের ইঙ্গিতে রাজার মৃত্যু হয়েছে"-এও বর্ণিত হয়েছে। মধ্যযুগে সেন্ট অগাস্টিন, সেন্ট টমাস এক্যুইনাস প্রমুখ চিন্তাবিদগণ এ মতবাদ প্রচার করেন। সেন্ট অগাস্টিনের মতে, "রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বর শাসক মনোনীত করেন।" কোনো সময় শাসক যদি অত্যাচারী হন, তাহলে বুঝতে হবে ঈশ্বর প্রজাদের শাস্তির জন্য সে ব্যবস্থা করেছেন। সতেরো শতকে এ মতবাদ প্রচারিত হয় নতুনভাবে। গণচেতনার উন্মেষের ফলে রাজারা নিজ কর্তৃত্ব কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে এ মতবাদের আশ্রয়গ্রহণ করেন ষোলো ও সতেরো শতকে। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস্ (James I) এবং ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই (Louis XIV) এ মতবাদের ওপর ভিত্তি করে জনগণের ওপর চরম কর্তৃত্ব দাবি করেছিলেন। চতুর্দশ লুই বলতেন, "আমিই রাষ্ট্র।" ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি শাসনভার লাভ করেছেন। ইংল্যান্ডের লেখক ফিলমার (Filmer) এ মতবাদের সমর্থনে লেখনী ধারণ করেন। হিন্দুশাস্ত্রেও এ মতবাদ সমর্থিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। তবে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান পণ্ডিতরা এ মতবাদ সমর্থন করতেন না। ইসলামে বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ সমর্থন করা হয় না, যদিও বলা হয়েছে, খলিফা আল্লাহর প্রতিনিধি।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

ঐশ্বরিক মতবাদ

সমালোচনা : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদের সমালোচনা করা হয়। যেমন-

” এ মতবাদকে বিপজ্জনক বলে আখ্যায়িত করা হয়। স্বার্থান্বেষীদের হাতে এ মতবাদ বহুবার অত্যাচারের হাতিয়ারস্বরূপ হয়ে উঠেছে। এর ফলে রাজার হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। কথিত আছে, ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই বলতেন, ‘আমিই রাষ্ট্র।' এ মতবাদ অনাচারের সহায়ক ছিল।

” এ মতবাদ গণতন্ত্রের বিরোধী। এর ফলে রাজা কোনো কাজের জন্য বিধাতার কাছে দায়ী থাকেন, জনসাধারণের কাছে নয়। কিন্তু গণতন্ত্রে জনগণই চরম ক্ষমতার অধিকারী। শাসকরা গণতন্ত্রে জনসাধারণের কাছে দায়ী থাকেন । সুতরাং এ মতবাদ বর্তমানকালে অচল।

” রাষ্ট্র কোনোক্রমেই দৈব প্রতিষ্ঠান নয়। সুতরাং বিধাতা কর্তৃক তা সৃষ্ট ও পরিচালিত হতে পারে না। ধর্মযাজক হুকারের (Hooker) মতে, “বিশ্বাস ও ধর্মীয় বিষয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রয়োজন, কিন্তু রাজনৈতিক বিষয় মুক্তবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন ।

” ঐশ্বরিক মতবাদে বিশ্বাসের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যুক্তির ওপর তেমন কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। অধ্যাপক ফিগিসের (Figgis) কথায়, “আধুনিককালে এ মতবাদ অচল। কেননা যুক্তির প্রাধান্য ছাড়া বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য নয়।”

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

বলপ্রয়োগ মতবাদ

বলপ্রয়োগ মতবাদের মূলকথা হচ্ছে, সবলরা দুর্বলদেরকে দৈহিক শক্তিবলে অধীনস্থ করে তাদের ওপর আইনকানুন চাপিয়ে আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করে রাষ্ট্র গঠন করেছে। প্রাচীনকালে মানুষ ছোট ছোট গোত্রে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত। তখন আন্তঃগোষ্ঠীয় সংঘাত প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। পরাজিত গোষ্ঠী বিজয়ী গোষ্ঠীর অধীন হতো। বিজয়ী গোষ্ঠীর প্রধানের শাসন তারা মানতে বাধ্য হতো। পরবর্তীতে অন্যান্য গোষ্ঠীও পরাজিত হয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠীর অধীন হতো। এভাবে বৃহৎ জনগোষ্ঠী ও এলাকা শক্তিশালী গোষ্ঠীর অধীনস্থ হয়ে রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি পেত।

ডেভিড হিউম, জেংকস জেলেনিক প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলপ্রয়োগ মতবাদের সমর্থক। জেংকস বলেন, "ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, আধুনিক সব রাষ্ট্রব্যবস্থা সার্থক রণকৌশলের ফলশ্রুতি।"

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

বলপ্রয়োগ মতবাদ

জেলেনিকের মতে, "শক্তিশালী নেতা তার অনুগামী যোদ্ধাদের সহায়তায় যখন চলনসই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ওপর স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে তখনই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।" বলপ্রয়োগ মতবাদের আসল কথা বলপ্রয়োগের ফলে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে এবং শক্তি প্রয়োগ দ্বারা তা টিকে থাকবে।

প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে এ মতবাদের প্রভাব ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। গ্রিক বীর আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, চেঙ্গিস খাঁ, সম্রাট আকবর প্রমুখ রাজা-বাদশাহ সম্রাটদের যুদ্ধ ও রাজ্যজয়ের কাহিনিতে ইতিহাস সমৃদ্ধ।

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ শক্তি প্রয়োগ মতবাদে বিশ্বাসী। ম্যাকিয়াভেলি, হিউম, জেংকস প্রমুখ তাদের বক্তব্যে এ মতবাদ সমর্থন করেছেন। কার্ল মার্কস এবং ম্যাক্স ওয়েবারও বলপ্রয়োগের গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। মোয়াজালে

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

বলপ্রয়োগ মতবাদ

কার্ল মার্কসের মতে, দাস সমাজব্যবস্থা, সামন্ত সমাজব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ভূমির মালিক এবং উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিক সবসময় চেষ্টা করতেন তাদের সম্পদ ও ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য। এজন্য প্রয়োজন একটি সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। এজন্যই তারা অতীতে নিজ স্বার্থেই রাষ্ট্র গঠন করেছে এবং তা পরিচালনার জন্য সরকার গঠন করেছে।

কার্ল মার্কস বল বা শক্তির কথা স্বীকার করেছেন। বল বা শক্তি প্রয়োগ করে সম্পদশালী ব্যক্তিরা যেমন রাষ্ট্র ও সরকারকে শোষণের হাতিয়ারে পরিণত করেছে তেমনই শক্তি বা বলপ্রয়োগ করেই তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে এবং শ্রেণিহীন সমাজ গঠন করতে হবে।

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারও বিশ্বাস করেন যে, বল বা শক্তিই হচ্ছে রাষ্ট্র শক্তির মূলভিত্তি। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং টিকে রয়েছে বল বা শক্তি প্রয়োগ ক্ষমতা দ্বারাই। যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন বা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে থাকবেন তাদের হাতে এ ক্ষমতা থাকতে হবে। তবে ম্যাক্স ওয়েবার রাষ্ট্র কর্তৃত্বকে মনে করতেন একটি সূক্ষ্ম শিল্পকলার মতো। রাষ্ট্র চালানোর জন্য শাসকের থাকতে হবে যুক্তবাদী ও গঠনমূলক চিন্তাচেতনা। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলপ্রয়োগ করার যুক্তিযুক্ত কারণ থাকতে হবে। শাসক ও প্রশাসন পরিচালকদের আইনগত ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকতে হবে। ম্যাক্স ওয়েবার শ্রেণিসংগ্রাম বা শ্রেণিসংঘাতের পরিবর্তে অভিভাবকসুলভ নেতৃত্ব ও সম্মোহনী নেতৃত্বের গুরুত্বকেই রাষ্ট্র গঠনের মূল শক্তি বলে চিহ্নিত করেছেন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

বলপ্রয়োগ মতবাদ

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলপ্রয়োগ মতবাদের পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখালেও এর বিপক্ষে সমালোচকরা অনেক যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। সমালোচকদের দৃষ্টিতে বলপ্রয়োগ মতবাদ কী, সে সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে বলপ্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কিন্তু একমাত্র উপাদান নয়। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ক, ধর্ম, অর্থনৈতিক উপাদান এবং রাজনৈতিক চেতনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং রাষ্ট্র রক্ষার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগই যদি একমাত্র উপাদান হতো তবে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পাশাপাশি কম শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো টিকে থাকা সম্ভব হতো না ।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সম্মতি ও সমর্থনই সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি। রাষ্ট্রে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা বা রাষ্ট্র টিকে থাকার জন্য শক্তিই একমাত্র উপাদান নয়। তাই বলা হয়ে থাকে— "শক্তি নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি।"

বলপ্রয়োগ মতবাদ মানবীয় গুণাবলি অস্বীকার করে। মানব চরিত্রের যে অনেক ভালো গুণ থাকতে পারে এ মতবাদে সেগুলো উপেক্ষিত হয়েছে।

বলপ্রয়োগ মতবাদ মানবতাবিরোধী। এ মতবাদে শুধু মানবজাতির খারাপ দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু মানবজাতির উদারতা ও মহত্ত্ব সম্পর্কে নীরবতা পালন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

বলপ্রয়োগ মতবাদ

রাষ্ট্রের জন্মের মূলে শক্তি প্রয়োগ যদি একমাত্র উপাদান হয় তাহলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শক্তি প্রয়োগের মানসিকতা জন্মলাভ করতে পারে। ফলে রাষ্ট্রীয় সংহতি ও ঐক্য বিনষ্ট হতে পারে।

এ মতবাদে দেখা যাচ্ছে যে, শাসক শক্তির সাহায্যে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন যাকে স্বৈরতন্ত্র বলা হয়। সুতরাং এ মতবাদ স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক।

শক্তি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে- একথা সর্বজন স্বীকৃত। তবে চিরদিন যে শক্তিই রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখবে- একথা সর্বজন স্বীকৃত নয়।

এ মতবাদ যুদ্ধ সমর্থন করে। যুদ্ধই যতসব অশান্তির কারণ। এ মতবাদ শান্তিবিরোধী।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

বলপ্রয়োগ মতবাদ

বলপ্রয়োগ মতবাদের সমালোচনা করলেও এর গুরুত্ব সমাজবিজ্ঞানে বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অস্বীকার করা যায় না। কারণ শক্তি ছাড়া রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। তা যদি হতো তবে রাষ্ট্র সশস্ত্র বাহিনী গঠন ও সংরক্ষণ করত না। তাছাড়া শক্তিশালী রাষ্ট্রের পাশাপাশি দুর্বল রাষ্ট্র টিকে থাকলেও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর নতজানু পররাষ্ট্র নীতি অবলম্বনে উদাহরণের অভাব নেই। অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য কিছু না কিছু শক্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রাচীনকালে, মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে শক্তি প্রয়োগ মতবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়ে, রাজায় রাজায় লড়াই ও রাজ্যবিস্তারের কাহিনিতে ইতিহাসের পাতা ভরপুর। মধ্যযুগেও ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিবলে রাজ্যবিস্তার ঘটেছে। শক্তির ভিত্তিতেই রোম সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে। হব্স ও ম্যাকিয়েভেলি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শক্তিশালী শাসকের কথা বলেছেন। এ মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে মুসোলিনি ও হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজিয়েছেন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

সামাজিক চুক্তি মতবাদ

সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূলকথা এই যে, "পূর্বে মানুষ একটি প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ প্রকৃতির আইন অনুযায়ী চলত এবং প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করত। কিন্তু প্রকৃতির আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের স্ব-স্ব ব্যাখ্যার ফলে প্রকৃতির রাজ্যে জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করে।"

দার্শনিক টমাস হবক্স, জন লক ও জ্যাঁ জ্যাক রুশো সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থক। সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবর্তক হলেন জ্যাঁ জ্যাক রুশো। ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত 'লেভিয়াথান' নামক গ্রন্থে ব্রিটিশ দার্শনিক হক্স (Hobbes) সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ ছিল স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও ঈর্ষাকাতর। প্রকৃতির রাজ্যে আইন ও বিচার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের মধ্যে সার্বক্ষণিক সংঘর্ষ লেগেই থাকত। এমন একটি অসহনীয় অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে মানুষ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

সামাজিক চুক্তি মতবাদ

১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে জন লক তার 'টু ট্রিটিজেস অন সিভিল গভর্নমেন্ট' নামক গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যাদান করেন। তার মতে, রাষ্ট্রপূর্ব অবস্থায় মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। তারা প্রাকৃতিক আইন মেনে চলত এবং শান্তিপ্রিয় ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যা দেওয়া এবং আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়ার নির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ ছিল না। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার লক্ষ্যে মানুষ নিজেদের মধ্যে দুটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়।

ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তার 'সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, রাষ্ট্রপূর্ব অবস্থায় প্রকৃতির রাজ্য ছিল সুখময়, স্বর্গীয় লীলাভূমি। সেখানে মানুষ অবাধ সুখ ও অপার শান্তিতে বসবাস করত। কিন্তু কালক্রমে সম্পত্তির ধারণা প্রাধান্য পাওয়ায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিবাদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সবাই মিলে চুক্তির মাধ্যমে প্রথমে সমাজ ও পরে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

সামাজিক চুক্তি মতবাদ

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সামাজিক চুক্তি মতবাদকে গুরুত্বসহকারে বিচার করলেও সমালোচকদের দৃষ্টিতে সামাজিক চুক্তি মতবাদে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলো ধরা পড়েছে-

প্রথমত, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ মতবাদ অনেকটা দুর্বল। কেননা মানবসমাজ নিজেদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে, মানব ইতিহাসে এমন কোনো সঠিক হদিস মেলে না। এ মতবাদে মানব চরিত্রের যে চিত্র আঁকা হয়েছে ইতিহাস তার প্রমাণ বহন করে না।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক চুক্তি মতবাদ অযৌক্তিকতার দোষে দূষিত। প্রাকৃতিক রাজ্যে জনগণ কিছু কিছু অযৌক্তিক অধিকার ভোগ করত, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজমান ছিল- এগুলো কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক পরিবেশে জনগণের মধ্যে চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণা বাস্তব নয়। রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ হঠাৎ করে জন্ম নেয় না।

চতুর্থত, চুক্তিবাদ স্বীকার করে নিলে রাষ্ট্রকে খামখেয়ালি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্র মানবীয় মহান প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যকিছু নয়। রাষ্ট্র কোনো যথেচ্ছাকৃত ফল নয়।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

সামাজিক চুক্তি মতবাদ

পঞ্চমত, সামাজিক চুক্তি মতবাদ সমাজজীবনে বিপজ্জনক পন্থার ইঙ্গিত দেয়। কর্তৃপক্ষকে পদচ্যুত করার ইঙ্গিত এ মতবাদে প্রতিষ্ঠিত একটি সত্য। কেননা রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদে বর্ণিত চিন্তাধারার সাথে ফরাসি বিপ্লবের যোগসূত্র ছিল।

তাছাড়া কর্তৃপক্ষকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের জন্ম দেওয়া হয়েছে এ মতবাদে।

ষষ্ঠত, সামাজিক চুক্তি মতবাদ কল্পনাপ্রসূত। কারণ সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তারা এ মতবাদের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে একমত হতে পারেননি।

তদুপরি বলা যায়, সামাজিক চুক্তি মতবাদ নানারকম সমালোচনা দ্বারা জর্জরিত হলেও এ মতবাদ একেবারে তার নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলেনি। এ মতবাদ মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিয়েছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

বিবর্তনমূলক মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে যতগুলো মতবাদ রয়েছে তন্মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ অধিক জনপ্রিয় ও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। ঐতিহাসিক মতবাদের মূলকথা হচ্ছে সমাজজীবনের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে। এ বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন উপাদানের সহায়তা লাভ করে রাষ্ট্র আধুনিক রূপলাভ করেছে। ঐতিহাসিক মতবাদের সমর্থক হলেন অধ্যাপক গার্নার, বার্জেস প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। অধ্যাপক গার্নারের (Garner) মতে, "রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নয়, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি, পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি কিংবা পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে উৎপত্তি লাভ করেনি। বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।" অধ্যাপক বার্জেস (Burgess) বলেছেন, "রাষ্ট্র মানবসমাজের ক্রমবিবর্তনের ফল।"

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

বিবর্তনমূলক মতবাদ

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের বিবর্তনের পথে কতিপয় উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপাদানগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

রক্তের সম্পর্ক: রক্তের সম্পর্ক আদিম সমাজে মানুষকে একত্রে বসবাস করার মূল প্রেরণা দান করে গড়ে ওঠে পরিবার। পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে গড়ে ওঠে গোত্র। গোত্র বৃদ্ধি পেয়ে কালক্রমে উপজাতি গঠন করে আর উপজাতি রাজনৈতিক সমাজ তথা রাষ্ট্র গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এভাবে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

ধর্মের বন্ধন: পরিবারের সম্প্রসারণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক শিথিল হলে ধর্ম রক্তের বন্ধনের ভূমিকা গ্রহণ করে। শক্তিশালী কোনো কালজয়ী পুরুষের নামে পূজা-অর্চনা ও স্রষ্টার প্রতি গভীর বিশ্বাসবোধ একই প্রকার ধর্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। ধর্মচর্চা ও ধর্মগুরুর বিধানাবলি রাষ্ট্রের অবকাঠামো গড়ে তোলে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

বিবর্তনমূলক মতবাদ

যুদ্ধবিগ্রহ: গোত্রে গোত্রে সংঘাত, উপজাতির মধ্যে হানাহানি ও জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে শক্তিধর নেতার আবির্ভাব ঘটে। ফলে চলনসই ভূখণ্ডের অধিকারী নেতার নেতৃত্বে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রাচীনকাল শিকারি জীবন থেকে শুরু করে কৃষিসমাজে উত্তরণের সময়কাল পর্যন্ত মানুষ সকলে অংশ বণ্টন করে সম্পত্তি ভোগ করত। কৃষি ও শিল্প সমাজে উত্তরণের পূর্বে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা ছিল না। কিন্তু কৃষি ও শিল্পভিত্তিক আর্থিক জীবনব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা জোরদার হতে থাকে। সম্পত্তি রক্ষা ও ভোগ করার প্রেরণা থেকে মানুষ আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এরূপে সম্পত্তি ও আর্থিক প্রয়োজনে মানুষ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ফলে সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

বিবর্তনমূলক মতবাদ

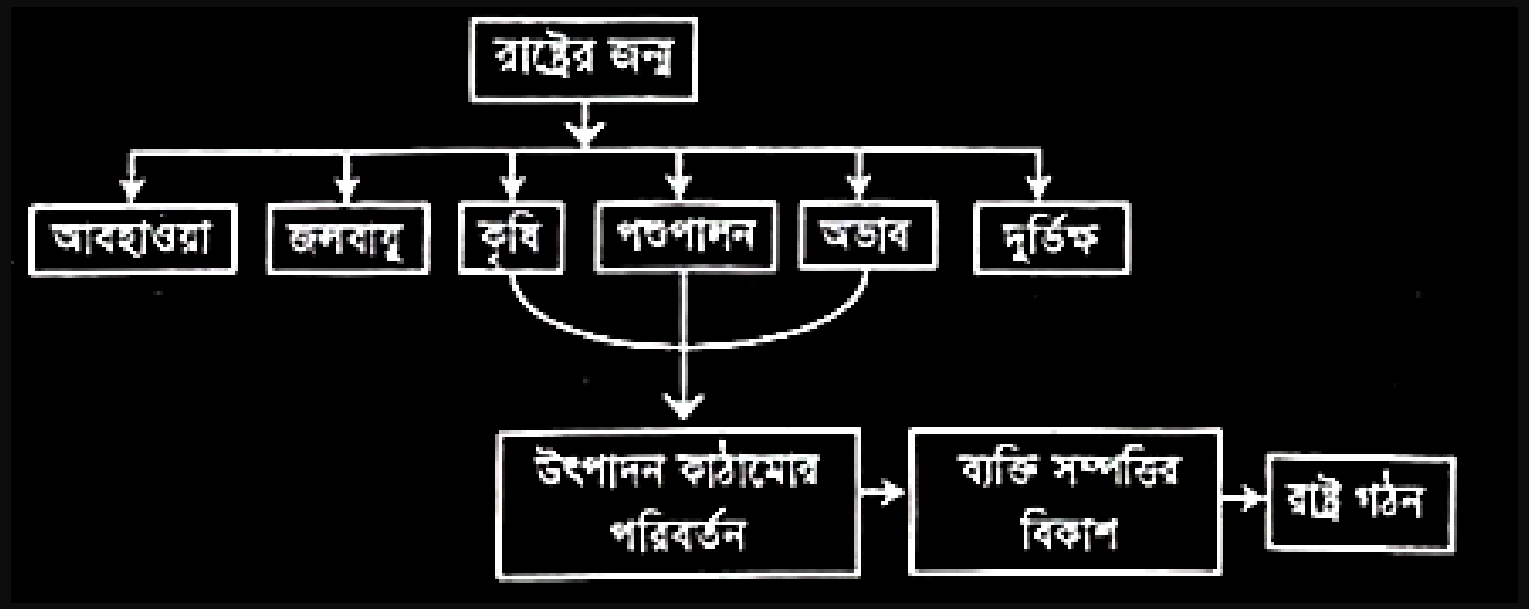

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

বিবর্তনমূলক মতবাদ

উন্নত সামাজিক জীবন: সমাজ থেকে বিশৃঙ্খলা ও অন্যায় দূর করার জন্য এবং উন্নত সামাজিক জীবন গঠনের জন্য দলপতি নিয়োগ করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে এ দলপতিই রাষ্ট্র সৃষ্টি করে রাজা হন।

আইন: মানুষ শান্তিতে বসবাস করার জন্য নিয়মশৃঙ্খলার প্রয়োজন অনুভব করে। আর তাই প্রয়োজন হয় আইন তৈরি করা। ফলে উদ্ভব হয় সরকার ও রাষ্ট্রের।

অবদমন বা সার্বভৌমত্ব: 'অবদমন' শব্দের অর্থ বিজয় বা অধিকার। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার বিকাশে বিজয় বা অধিকার সংরক্ষণের ক্ষমতাই হচ্ছে অবদমন। এ অবদমন একটি জটিল আন্তঃপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত, রাষ্ট্রের উৎপত্তির পিছনে মৌল উপাদান অবদমন। এ অবদমন প্রক্রিয়ায় তিনটি উপাদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও রাজনৈতিক সমাজের আন্তঃপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব তৈরি হয় এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটে। আদিম সমাজ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও রাষ্ট্রের জন্ম হয়নি। কারণ অবদমনের অভাবে সমাজের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ছিল।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

বিবর্তনমূলক মতবাদ

- অবদমন গড়ে ওঠে জটিল আন্তঃপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যা নিচে প্রবাহচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো–

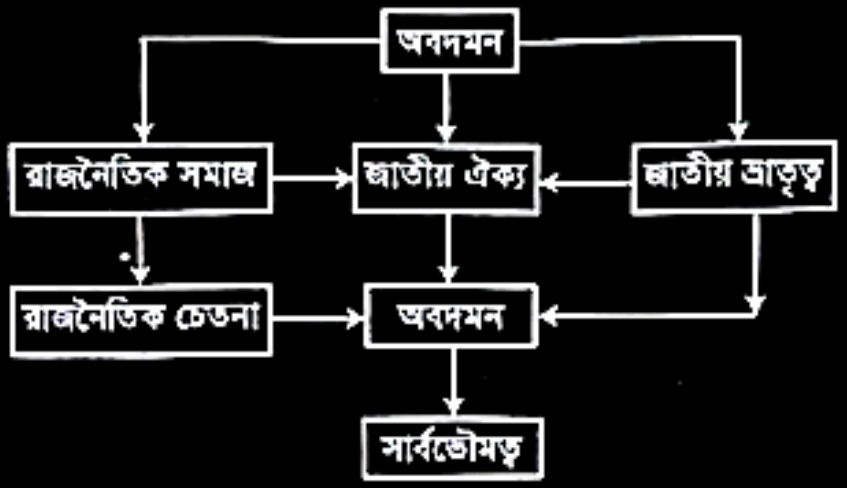

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

বিবর্তনমূলক মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তিসংক্রান্ত ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন-

প্রথমত, অতীতকালে মানুষ গোষ্ঠীহীন ও বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করত। তখন তাদের মধ্যে গোষ্ঠী প্রবণতা ছিল না। রক্তের বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে মানুষ গোষ্ঠী গঠনে উজ্জীবিত হয়। গোষ্ঠী গঠনের ফলে মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয় ঐক্য ও সংহতিবোধ।

দ্বিতীয়ত, প্রাচীনকালে মানুষ বর্বর ও অসভ্য ছিল। তখন মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদের প্রভাবে বর্বর ও অসভ্য মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার কোনো বালাই ছিল না। একজনের বিপদ-আপদে অন্যজন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিত না। অন্যদিকে, ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদের প্রভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে। ফলে গড়ে ওঠে সমাজ ও রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

বিবর্তনমূলক মতবাদ

চতুর্থত, ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদের প্রভাবে মানুষ অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। কাজেই মানুষের অধিকার রক্ষায় এ মতবাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় নানা উপাদানের কার্যকারিতার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে। এজন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদকে সঠিক মতবাদ বলা হয়। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল যথার্থই বলেছেন, "রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে এবং এটি একটি স্বাভাবিক সংস্থা।"

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সামাজিক ব্যবস্থা

টপিক – ০৫ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

মানবসমাজের একটি মৌলিক সত্তা হচ্ছে ক্ষমতা। ক্ষমতার প্রয়োগ সমাজের চালিকাশক্তি হয়ে কাজ করছে। ক্ষমতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Power। সাধারণ অর্থে কাজ করার সামর্থ্যকে Power বা শক্তি বলা হয়। সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় মানবীয় পরিসরে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রাধান্য হচ্ছে Power বা ক্ষমতা। অর্থাৎ সামাজিক জীবনে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্যসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীসমূহের ওপর প্রভাব বা আধিপত্য বিস্তার করাকেই ক্ষমতা বলা হয়।

ম্যাক্স ওয়েবার ক্ষমতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "ক্ষমতা হলো অপরের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য তাতে তাদের সম্মতি নাও থাকতে পারে।" (Power is the ability to control the behavior of others even in the absence of their consent).

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

ডেভিড পোপেনো-এর মতে, "ক্ষমতা হচ্ছে কোনো লোক বা গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করার যোগ্যতা, তাতে ওই লোক বা গোষ্ঠী সহযোগিতা করতেও পারে আবার নাও করতে পারে।" (Power is the capacity of people or groups to control or influence the action of these whether, those others with to co-operate or not).

কিংসলে ডেভিস-এর মতে, "ক্ষমতা হচ্ছে কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে অপরের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা।" (Power is defined as the determination of the bebaviour of others in accordance with one's own need).

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্স (Talcott Parsons) ক্ষমতাকে যৌথ উদ্দেশ্য অর্জনের একটি ইতিবাচক সামাজিক সামর্থ্য হিসেবে দেখেন।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

স্নেলসার বলেন, "ক্ষমতা হলো এমন সামর্থ্য যা কারও ইচ্ছা অন্যান্যদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় এবং সম্পদকে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজে লাগানো যায়।" (Power is the ability to impose one's will no others and the ability to mobilize resource to achieve a goal).

আর্নল্ড গ্রিন-এর মতে, "ক্ষমতা হচ্ছে নিতান্তই অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য যাতে তারা যা চায় তা সম্পাদন করতে পারে।" (Power is simply the extent of capability to control others so that they will do what they are wanted to do).

অতএব বলা যায়, ক্ষমতা একটি বিমূর্ত ধারণা এবং সার্বজনীন প্রপঞ্চ। এটি হলো এমন এক ধরনের শক্তি, সামর্থ্য বা যোগ্যতা যার গুণে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্যান্যদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নির্দিষ্ট গন্তব্যে পরিচালিত করে।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

কর্তৃত্ব একটি সর্বজনীন বিষয়। ইংরেজি Authority শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কর্তৃত্ব। শুধু রাজনীতি বা মানবসমাজে নয়, জীবজগতের প্রতিটি স্তরে কর্তৃত্বের উপস্থিতি বিদ্যমান। যার শক্তি বা ক্ষমতা আছে সে দলের অন্য সবার ওপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তার করে। এদিক থেকে কর্তৃত্ব শাশ্বত এবং জন্মগত বিষয়। কেউ কর্তৃত্ব আরোপ করে আবার কেউ কর্তৃত্বের অধীনে বশ্যতা স্বীকার করে।

কর্তৃত্বের সংজ্ঞায় B. De Jouvenel তার 'Sovereignty (1957: 33)' গ্রন্থে আলোচনা করেন। সেখানে ঐচ্ছিক সম্মতির সাথে কর্তৃত্বকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ সম্মতি বা স্বীকৃতি ব্যতীত কর্তৃত্বের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। তাই সম্মতির পরিসমাপ্তি ঘটলে কর্তৃত্বও শেষ হয়ে যায়।

ম্যাক্স ওয়েবার Max Weber এর মতে, কর্তৃত্ব হচ্ছে এক ধরনের ক্ষমতাগত সম্পর্ক যেখানে শাসক অপরাপর জনগণের ওপর নিজের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেন এ বিশ্বাস থেকে যে, ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং শাসিত জনগোষ্ঠী তাকে এবং তার আদেশ-নির্দেশকে মান্য করে।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

কর্তৃত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞায় G. D. Mitchell তার 'A Dictionary of Sociology' গ্রন্থে আলোচনা করেন। সেখানে কর্তৃত্বকে ক্ষমতার একটি বিশেষ রূপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা আদেশ এবং শৃঙ্খলার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় এবং আইনগত বৈধতার জন্য জনগণ এটি মেনে নিতে বাধ্য হয়। আইনগত বৈধতা ছাড়া কর্তৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা নেই। এ কর্তৃত্ব রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পরিচালিত হলে তাকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বলে। অর্থাৎ কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি বা দল যখন জনগণের ওপর প্রভাব খাটানো আইনগত স্বীকৃতি ও অধিকার পায় তখন তাকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বলে।

সুস্থ, সুশৃঙ্খল সমাজজীবন বজায় রাখার জন্য কর্তৃত্ব অপরিহার্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারকে কর্তৃত্ব বলা হয়। আবার সামাজিক সংঘ, সমিতির কর্মকর্তাদের সামাজিক কর্তৃত্বের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে যা ছাড়া রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ক্ষমতাসম্পন্ন ও কার্যকরী হয় না। উপাদানগুলো হলো-

১. জনগণের ওপর ক্ষমতা ও প্রভাব বিদ্যমান থাকা,

২. দলের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রভাব বিদ্যমান থাকা,

৩. আইনগত ক্ষমতা থাকা,

৪. নিয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ক্ষমতা বিদ্যমান থাকা ইত্যাদি।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

কর্তৃত্বের ধরন | Types of Authority

কর্তৃত্বের ধরন সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী Max Weber কর্তৃত্বের উৎসের উপর ভিত্তি করে একে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলো-

১. ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব (Traditional Authority)
২. ইন্দ্রজালিক বা সম্মোহনী কর্তৃত্ব (Charismatic Authority)
৩. যৌক্তিক আইনগত কর্তৃত্ব (Rational Legal Authority)

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

নিচে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দেওয়া হলো-

১. ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব (Traditional Authority): ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব হচ্ছে সে ধরনের কর্তৃত্ব, যা প্রাক আধুনিক সমাজে দেখা যায়, যা কোনো বিশ্বাস বা ঐতিহ্যগত অনুমোদনের ফলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি ভোগ করে থাকে। ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করাই হলো ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের কর্তৃত্ব সবচেয়ে আবেদনশীল এবং গতানুগতিক। ঐতিহ্যের বৈধতার স্বীকৃতির ভিত্তিতেই এ ধরনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন- গ্রেট ব্রিটেনের রাজতন্ত্র।

২. ইন্দ্রজালিক বা সম্মোহনী কর্তৃত্ব (Charismatic Authority): ইন্দ্রজালিক বা সম্মোহনী কর্তৃত্ব হচ্ছে সেই ধরনের কর্তৃত্ব যা কোনো ব্যক্তি তার অসাধারণ গুণাবলি; যেমন- নৈতিক, সাহসিক কিংবা ধর্মীয় গুণাবলির জন্য অন্যদের কাছ থেকে আনুগত্য দাবি করে। ব্যক্তিগত গুণাবলির বদৌলতে তিনি তার সমর্থকদের মধ্যে গভীর প্রত্যয় ও শ্রদ্ধার মনোভাব এবং আনুগত্যের সৃষ্টি করেন। নেতার গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়েই সাধারণ জনগণ তার কর্তৃত্ব ও শাসন মেনে চলেন। এ ধরনের কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের উদাহরণ হলো- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, লেনিন, মহাত্মা গান্ধী, মাওসেতুং, নেপোলিয়ন, জর্জ ওয়াশিংটন প্রমুখ।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

৩. যৌক্তিক আইনগত কর্তৃত্ব (Rational Legal Authority): যখন কোনো ব্যক্তি যৌক্তিক কারণে বা আইনগত কারণে কারও ওপর কর্তৃত্ব করেন তাকে ম্যক্স ওয়েবার যৌক্তিক আইনগত কর্তৃত্ব বলেছেন। তার মতে, কেবল যৌক্তিক আইনগত কর্তৃত্বেরই আইনগত ভিত্তি এবং যুক্তিপ্রবণতা রয়েছে। কেননা 'Power is limited by law অর্থাৎ, ক্ষমতা এখানে আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। Weber এ ধরনের ব্যবস্থাকে যৌক্তিক আমলাতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করেন। এ ব্যবস্থা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।

সবশেষে বলা যায়, কর্তৃত্ব একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। সব সমাজেই কর্তৃত্ব আছে এবং সমাজের ওপর কর্তৃত্বের প্রভাবও রয়েছে। সামাজিক শৃঙ্খলা আনয়ন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক সংহতি রক্ষায় কর্তৃত্ব প্রভাব বিস্তার করে। কর্তৃত্ব সংস্কৃতি, প্রথা এবং ঐতিহ্যের ধারক-বাহক।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সামাজিক ব্যবস্থা

টপিক – ০৬ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পারস্পারিক সম্পর্ক

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পারস্পারিক সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পারস্পারিক সম্পর্ক

কর্তৃত্ব শব্দটি ক্ষমতার (Power) সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। ক্ষমতা থেকেই কর্তৃত্বে উদ্ভব হয়। কোনো নেতা বা নেতৃত্ব (Leadership) যখন তার ক্ষমতা বলে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তখন তাকে কর্তৃত্ব বলে। কর্তৃত্বের সাথে এখানে ক্ষমতার পাশাপাশি 'নেতৃত্ব' এবং 'প্রভাব' প্রত্যয় দুটিও বিশেষভাবে যুক্ত। কর্তৃত্বের অবিচ্ছেদ্য উপাদান ক্ষমতা (Power) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তাই এর আলোচনাও অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ। তবুও সমাজে সর্বস্তরে ক্ষমতার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এতে বলপ্রয়োগ এবং সামাজিক শৃঙ্খলার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থাকে কর্তৃত্ব বলে।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পারস্পারিক সম্পর্ক

ক্ষমতা	কর্তৃত্ব
১.ক্ষমতার উদ্ভব হয় মানবসমাজ বিকাশের কোনো একটি স্তরে। ২.শক্তি প্রয়োগের উপাদান রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। ৩.ক্ষমতার সাথে শক্তি প্রয়োগের সম্পর্ক থাকায় এটি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। ৪.কর্তৃত্বকে বাদ দিয়ে ক্ষমতার অবস্থিতি সম্ভব। ৫.ক্ষমতা বৈধ এবং অবৈধ উভয়ই হতে পারে।	১.কর্তৃত্বের উদ্ভব হয় ক্ষমতা ও বৈধতার একত্রিত উপস্থিতির ভিত্তিতে। ২.রাজনৈতিক কর্তৃত্ব শক্তি প্রয়োগের উপাদানের সাথে সম্পর্কহীন। ৩.কর্তৃত্বের সাথে বৈধতার সম্পর্ক থাকায় এটি স্থায়ী রূপলাভ করতে পারে। ৪. ক্ষমতাকে বাদ দিয়ে কর্তৃত্বের অবস্থিতি সম্ভব নয়। ৫.কর্তৃত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র বৈধ ক্ষমতা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সামাজিক ব্যবস্থা

টপিক – ০৭ শিক্ষার ধারণা

শিক্ষার ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

শিক্ষার ধারণা

মানবসমাজ মাত্রেরই একটি মৌলিক কার্যপ্রক্রিয়া হলো শিক্ষা। শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। গ্রিক চিন্তাবিদদের কাছে শিক্ষা হলো বিকাশ সাধনের স্বার্থে বিশেষ এক সুসংবদ্ধ ও সচেতন পদ্ধতি। শিক্ষা বলতে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে শিক্ষার্থীকে শিক্ষণ বা পাঠদানকেই শুধু বোঝায় না; শিক্ষা হলো প্রধানত শিক্ষার্থীকে বড় করে তোলা বা সাফল্যের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হওয়ার জন্য তার মধ্যে প্রয়োজনীয় অভ্যাস এবং মনোভাব-মানসিকতা গড়ে তোলা। এককথায় শিক্ষা হলো ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।

শিক্ষা শব্দটি সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে এসেছে। যার অর্থ শাসন, নির্দেশ, আজ্ঞা, নিয়ন্ত্রণ, তিরস্কার, শাস্তিদান ইত্যাদি। শিক্ষার আর একটি যথার্থ শব্দ হলো 'বিদ্যা'। বিদ্যা শব্দটি 'বিদ' ধাতু থেকে এসেছে। 'বিদ' বলতে 'জানা', 'জ্ঞান আহরণ' করাকে বোঝায়। শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ education। এ শব্দটি এসেছে মূল ল্যাটিন শব্দ থেকে। ল্যাটিন ভাষায় তিনটি মৌলিক শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা- educare, educere এবং educatum. educare শব্দের অর্থ হচ্ছে লালন-পালন করা (to rear up), প্রতিপালন করা (to bring up)। অর্থাৎ শিশুকে আদর-যত্নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। Educare শব্দের পরিপূর্ণ অর্থ হলো ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসা বা অন্তর্নিহিত শক্তি বা গুণাবলির বিকাশ সাধনে সহায়তা করা।

শিক্ষার ধারণা

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জন ডিউই-এর মতে, "শিক্ষা বলতে পরিপূর্ণ জীবন বিকাশকেই বোঝায়। পরিপূর্ণ বিকাশ বলতে সেসব গুণের বিকাশকে বোঝায় যা দ্বারা ব্যক্তি তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের সমস্ত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করতে পারে।

দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন, "শিক্ষা হলো মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের আবিষ্কার। অর্থাৎ মিথ্যাকে পরিহার করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে শিক্ষা।"

দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেন, "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হলো শিক্ষা।" (Education of sound mind in a sound society body).

প্লেটোর মতে, "শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী দেহ-মনের সার্বিক বিকাশ সাধন করা।" (Education develops in the body and soul of the pupil all the beauty and all the perfection he is capable of.)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হলো তা-ই যা আমাদের কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না, বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।"

মোটকথা, পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেঁচে থাকার যে কলাকৌশল তাই শিক্ষা।

শিক্ষার ধারণা

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objective of Education) : শিক্ষার কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন—

- শিক্ষা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে;
- গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশ ঘটায়;
- অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়;
- বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে;
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বৈষম্য দূর করে;
- মৌল ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে;
- সোহার্দ ও সহমর্মিতাবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সামাজিক ব্যবস্থা

টপিক – ০৮ শিক্ষার স্তর

শিক্ষার স্তর

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

শিক্ষার স্তর

কোনো দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি দেশেই শিক্ষাব্যবস্থাকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। সাধারণত শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা চারটি স্তর দেখতে পাই। তা হলো-

১. প্রাথমিক স্তর,
২. মাধ্যমিক স্তর,
৩. উচ্চ মাধ্যমিক স্তর এবং
৪. উচ্চ শিক্ষা।

শিক্ষার স্তর

নিচের ছকে বাংলাদেশের শিক্ষাস্তরগুলো দেখানো হলো–

শিক্ষার স্তর	শ্রেণি
প্রাক-প্রাথমিক	প্রাক – প্রাথমিক
প্রাথমিক	প্রথম – অষ্টম
মাধ্যমিক	নবম – দ্বাদশ
উচ্চশিক্ষা	স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি

শিক্ষার স্তর

বাংলাদেশের শিক্ষাস্তর

১. প্রাথমিক স্তর: যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম পাঠ শুরু হয় তা প্রাথমিক স্তর হিসেবে পরিচিত। এ প্রাথমিক স্তর থেকে ভবিষ্যৎ জ্ঞানার্জনের দ্বার উন্মোচিত হয়। এছাড়া এ স্তর মানুষের জ্ঞানের প্রাথমিক ভিত্তি। বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো সরকারি ও বেসরকারি প্রাইমারি বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ক্যাডেট স্কুল, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ও কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা ইত্যাদি।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হলো দুটি-

ক. মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং

খ. উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা।

২. মাধ্যমিক স্তর: প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের পর যে প্রতিষ্ঠানে পরবর্তী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তা মাধ্যমিক স্তর হিসেবে পরিচিত। মাধ্যমিক স্তর শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর। এ স্তরে শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল (মাধ্যমিক স্কুলগুলো আমাদের দেশে হাই স্কুল হিসেবে পরিচিত), ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, আলিয়া মাদ্রাসা ইত্যাদি।

শিক্ষার স্তর

৩. উচ্চ মাধ্যমিক স্তর: উচ্চ মাধ্যমিক স্তর শিক্ষাব্যবস্থার তৃতীয় স্তর। অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পরবর্তী কার্যক্রম হলো উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর। এ স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা একজন মানুষকে উচ্চশিক্ষা অর্জনে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে সহায়তা করে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো সরকারি ও বেসরকারি কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসা, ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ ইত্যাদি।

৪. উচ্চশিক্ষা: শিক্ষাব্যবস্থার সর্বশেষ স্তর হচ্ছে উচ্চশিক্ষা। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী স্তর এটি। কোনো শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করতে পারে। দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। উচ্চশিক্ষা একজন মানুষকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, সিনিয়র আলিয়া মাদ্রাসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।

শিক্ষার স্তর

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে বর্তমান শিক্ষার স্তর: শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রথম শিক্ষা কমিশন থেকে ২০১০-এর পূর্ব পর্যন্ত বেশকিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কোনো ব্যবস্থাতেই আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মেলানো সম্ভব হয়নি। তাই বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের জন্য নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতেই জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশন তার সুপারিশ এবং রিপোর্ট পেশ করে ২০১০ সালে।

শিক্ষার স্তর

শিক্ষানীতি ২০১০-মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ, জনমুখী উন্নয়ন এবং প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এ শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে।

কোনো দেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিবর্তন করার অর্থই হলো তাদের উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা। আর এ কর্মকাণ্ডকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন হলো উচ্চশিক্ষিত জনগণ। যা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করে থাকে। মানবসম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন কর্মসংস্থান, অন্যদিকে প্রয়োজন যেকোনো বৃত্তিকে বেছে নেওয়ার মানসিকতা। এসবই সম্ভব হয় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ফলে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সামাজিক ব্যবস্থা

টপিক – ০৯ শিক্ষার ভূমিকা ও কার্যাবলী

শিক্ষার ভূমিকা ও কার্যাবলী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

শিক্ষার ভূমিকা ও কার্যাবলী

শিক্ষার উদ্দেশ্য বা ভূমিকা প্রসঙ্গে দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কারও কারও মতে, ব্যক্তি-মানুষের মানসিক উন্নতি সাধনই হলো শিক্ষার উদ্দেশ্য। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতে, শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানার্জন। বিভিন্ন দিক থেকে সমাজজীবনে শিক্ষার ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যবহ।

বিশেষজ্ঞদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ভূমিকা সম্পর্কে কোনো সামগ্রিক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। তদুপরি এককভাবে প্রতিটি মতই আংশিক সত্যের সন্ধান দেয়। একারণে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

শিক্ষার ভূমিকা ও কার্যাবলী

মানুষের প্রকৃতি প্রদত্ত প্রবণতাগুলোকে বিকশিত করা এবং মানুষের মনে আদর্শ লক্ষ্যকে প্রবিষ্ট করানো শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। বাস্তবিক অর্থে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের সুপ্ত মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন। আমরা জানি, কতকগুলো সুপ্ত শক্তি বা বৃত্তি নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে। এসব সুপ্ত শক্তি বিকশিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে। তবে মানব প্রকৃতির মধ্যে সুপ্রবৃত্তি ছাড়াও বর্তমান থাকে বিভিন্ন ধরনের কুপ্রবৃত্তিও। সুপ্রবৃত্তিসমূহের উন্মেষ ও বিকাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে কুপ্রবৃত্তিগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন। শিক্ষাই এ ভূমিকা পালানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতএব বলা যায়, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের পক্ষে কল্যাণকর বৃত্তিসমূহের বিকাশ সাধন। ফরাসি দার্শনিক রুশোর মতে, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো জীবনের যাবতীয় গুণাবলির স্বাভাবিক বিকাশ।"

শিক্ষার ভূমিকা ও কার্যাবলী

স্বামী বিবেকানন্দ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "Education is the manifestation of perfection already in man.“ দেশ ও দেশবাসীর অতীত ও তার সংগীত-সাহিত্য, শিল্প-দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানকেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষা এ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বহন করে চলে। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যক্তির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উত্তর পুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত করে। সাধারণত শিক্ষাক্রমের অপেক্ষাকৃত উচ্চপর্যায়ে শিক্ষার এ উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার জন্য উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শিশু পাঠ্যপুস্তক এবং দেশাত্মবোধক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে দেশ ও জাতির ইতিহাস ও আনুষঙ্গিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে।

শিক্ষার্থীকে সঠিক তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহ করা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ভ্রান্ত মনোভাব ও অসামাজিক মনোবৃত্তি বর্তমান থাকে। এসবের সংশোধন করা দরকার। শিক্ষা এসব মনোভাব ও মানসিকতার ত্রুটিসমূহ সংশোধন করার পরামর্শ দেয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও শিক্ষার ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু বড় হয় পরিবার ও পরিবেশের পরিমণ্ডলে। এ সূত্রে সে বিভিন্ন অন্ধ আনুগত্য, বিশ্বাস ও ধারণা লাভ করতে পারে। এসবের ভিত্তিতেই ব্যক্তির মানসিকতা গড়ে ওঠে। স্বভাবতই সবসময় এ মানসিকতা ত্রুটিমুক্ত হয় না। শিক্ষাই একে ত্রুটিমুক্ত করে ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ করে।

শিক্ষার ভূমিকা ও কার্যাবলী

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতার মানসিকতা গড়ে ওঠে। এ সুস্থ প্রতিযোগিতার মানোভাব পরবর্তী জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। ফলশ্রুতিতে ব্যক্তির জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

শিক্ষায়তনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম থাকে। এ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিভিন্ন সময় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ক্রমানুসারে সাজানো হয়। এ তালিকায় যারা উচ্চস্থান অধিকার করে তারা কৃতিত্বের স্বীকৃতি লাভ করে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে পরবর্তী জীবনে তা গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার ভূমিকা ও কার্যাবলী

বাস্তবিক অর্থে শিক্ষার উদ্দেশ্য বহুমুখী। শিক্ষার কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে যেগুলো আশু বা প্রত্যক্ষ প্রকৃতির; আবার কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে যা চরম বা চূড়ান্ত প্রকৃতির। অনুরূপভাবে আবার শিক্ষার কতিপয় উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত এবং কতিপয় উদ্দেশ্য প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক। অধ্যাপক জোড শিক্ষার তিনটি বিশেষ উদ্দেশ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ তিনটি উদ্দেশ্য হলো-

১. শিক্ষার্থীকে আদর্শ জীবনযাপনের উপযুক্ত করে তোলা। এ উদ্দেশ্যে তার সুপ্ত গুণাবলি ও বৃদ্ধিসমূহকে বিকশিত করা;

২. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার যোগ্য নাগরিক হিসেবে তাকে উপযুক্ত করে তোলা;

৩. জীবিকার্জনের স্বার্থে রুজি-রোজগারের জন্য শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে তোলা।

বৈষয়িক ও বৃত্তিগত ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যক্তিকে জীবিকার্জনে সক্ষম নাগরিকরূপে পরিণত করার ব্যাপারে শিক্ষার ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা শিক্ষার্থীকে বৃত্তিগত বিষয়ে বিশেষভাবে প্রস্তুত হওয়ার কৌশল (Technique) শেখায়।। ফলে শিক্ষার্থী সমাজজীবনে একটি সুস্থ ও সম্মানজনক পেশায় যোগ দিতে পারে এবং তার পরিবারের প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়। এদিক থেকে বিচার করলে সমাজব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিকে উৎপাদনশীল কাজকর্মে অংশগ্রহণের উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য।

শিক্ষার ভূমিকা ও কার্যাবলী

ব্যক্তি-মানুষের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে রাজনীতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের উপযোগী করে তোলে। এ কারণে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই রাজনীতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের আনুপাতিক হার বেড়ে যায়। অর্থাৎ রাজনীতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং শিক্ষার মধ্যে একটি সদর্থক সম্পর্ক রয়েছে। সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সাধারণত রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শকের ভূমিকা পালন করেন এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সর্বোপরি, রাজনৈতিক আচার-আচরণের মানকে উন্নত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা সমাজস্থ ব্যক্তি-মানুষের তথা সমাজের সদস্যদের মাঝে আত্মবিশ্বাস ও বিচার বিবেচনার ক্ষমতা জাগ্রত করে। সমাজজীবনে ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্বের মাঝে এ নিজস্বত্তার চেতনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

শিক্ষা সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তিবর্গকে বাছাই করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে সমাজের অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিবর্গ সমগ্র সমাজ ও সমাজবাসীদের স্বার্থে কার্যকর ও অর্থবহ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন। শিক্ষার মাপকাঠিতে প্রমাণিত যোগ্যতা ও সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন পদ ও পদমর্যাদা লাভ করেন। অর্থাৎ সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রভাব বিস্তার করে। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম ই. ম্যুর (W. E. Moore), অধ্যাপক কিংসলে ডেভিস (Prof. Kingsley Davis) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সামাজিক ব্যবস্থা

টপিক – ১০ শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ

শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ

শিক্ষা সম্পর্কিত কার্ল মার্কসের মতবাদ

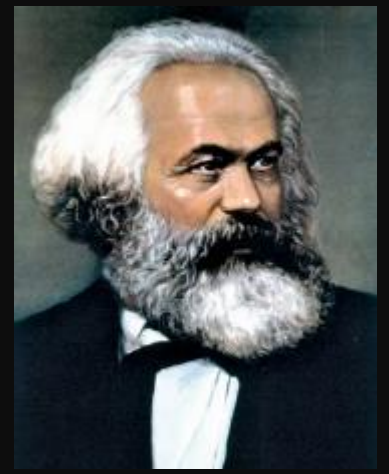

আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা হলেন কার্ল মার্কস। তিনি শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে পৃথকভাবে কোথাও আলোচনা করেননি। তবে সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তিনি শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। মার্কসের মূল সমাজ দর্শনকে ভিত্তি করেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে কার্ল মার্কস বলেন, "জ্ঞানের উৎস কী বা জ্ঞানের প্রকৃতি কীরূপ, তা আমাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। আর তা অনুসন্ধান করতে যাওয়া বৃথা।" তার মতে, ব্যক্তির জ্ঞান তার সামাজিক অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোনো বস্তু সম্পর্কে জানতে হলে বা বস্তুজগৎ সম্পর্কে জানতে হলে ব্যক্তিকে তার নিজের সঙ্গে বস্তুজগতের সম্পর্ক আছে সেটিকে উপলব্ধি করতে হবে। প্রাচীন দর্শনে জীবনের পরম সত্য উপলব্ধিকেই যে পরিপূর্ণ এবং প্রকৃত জ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল, মার্কস তা স্বীকার করেননি। সত্যকে এককালীন সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। মার্কসীয় ধারণা অনুযায়ী, মানুষকেই সত্যকে প্রমাণ করতে হবে। জ্ঞান বা সত্যকে মার্কস বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন।

শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ

শিক্ষা সম্পর্কিত কার্ল মার্কসের মতবাদ

আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা হলেন কার্ল মার্কস। তিনি শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে পৃথকভাবে কোথাও আলোচনা করেননি। তবে সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তিনি শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। মার্কসের মূল সমাজ দর্শনকে ভিত্তি করেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে কার্ল মার্কস বলেন, "জ্ঞানের উৎস কী বা জ্ঞানের প্রকৃতি কীরূপ, তা আমাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। আর তা অনুসন্ধান করতে যাওয়া বৃথা।" তার মতে, ব্যক্তির জ্ঞান তার সামাজিক অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোনো বস্তু সম্পর্কে জানতে হলে বা বস্তুজগৎ সম্পর্কে জানতে হলে ব্যক্তিকে তার নিজের সঙ্গে বস্তুজগতের সম্পর্ক আছে সেটিকে উপলব্ধি করতে হবে। প্রাচীন দর্শনে জীবনের পরম সত্য উপলব্ধিকেই যে পরিপূর্ণ এবং প্রকৃত জ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল, মার্কস তা স্বীকার করেননি। সত্যকে এককালীন সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। মার্কসীয় ধারণা অনুযায়ী, মানুষকেই সত্যকে প্রমাণ করতে হবে। জ্ঞান বা সত্যকে মার্কস বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন।

শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ

শিক্ষা সম্পর্কিত কার্ল মার্কসের মতবাদ

মার্কস মনে করেন, মানবসমাজের মাঝে যে শ্রেণিসংগ্রাম চলছে, শিক্ষা তারই অপরিহার্য অঙ্গ। আর একারণে মার্কস এবং এঙ্গেলস তাদের কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে মার্কস ও এঙ্গেলস শিক্ষা সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন, সেগুলোকে একত্রিত করলে আমরা মার্কসীয় শিক্ষার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারি। মার্কসীয় শিক্ষার তাৎপর্য নিম্নরূপ-

- মার্কস বলেন, বস্তুজগতের সঙ্গে ব্যক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ায় জ্ঞান সংগৃহীত হয়। এ পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রধান হাতিয়ার হলো ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলো। কাজেই শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর তথা ব্যক্তি-মানুষের ইন্দ্রিয়গুলোকে জাগ্রত করতে হবে ।
- মার্কসীয় ধারণামতে, জ্ঞানের কোনো চরম অবস্থা নেই। অর্থাৎ কোনো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে চরম জ্ঞান হিসেবে বিবেচনা বা গ্রহণ করা যায় না। বরং জ্ঞান একটি প্রক্রিয়া। কাজেই শিক্ষাব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে । যাতে এ প্রক্রিয়ার চলমান বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে ।

শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ

শিক্ষা সম্পর্কিত কার্ল মার্কসের মতবাদ

- মার্কসীয় ধারণামতে, জ্ঞানের বিকাশ সামাজিক বিকাশেরই অঙ্গ। আবার সামাজিক বিকাশ ও জ্ঞানের বিকাশ উভয়ই চলমান প্রক্রিয়া।
- মার্কস মনে করেন, শিক্ষা হলো সমাজের এক ধরনের উৎপাদনশীল শক্তি। শ্রেণিসংগ্রামের উপাদান এবং উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে যেমন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়, তেমনি শ্রেণিহীন সমাজের স্থায়িত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়।
- মার্কসীয় ধারণামতে, শিক্ষার তত্ত্বের সাথে শিক্ষাক্ষেত্রের কার্যাবলির কোনোরূপ পার্থক্য নেই। যে জ্ঞান পরীক্ষিত এবং জীবনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত, তার জন্য তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরে রাখা নিষ্প্রয়োজন। মার্কস মনে করেন, শিক্ষায় তত্ত্বের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দেওয়াটা অধিক যৌক্তিক ।
- মার্কসীয় ধারণা মতে, শিক্ষা সবসময় হবে সৃজনশীল। শিক্ষার মধ্য দিয়ে সত্যের নতুন প্রকৃতিকে আবিষ্কার করতে হবে। শিক্ষার দায়িত্ব হবে সত্যের নতুন রূপ আবিষ্কার করা।

শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ

শিক্ষা সম্পর্কিত কার্ল মার্কসের মতবাদ

মার্কস জ্ঞান ও সত্য সম্পর্কে তার মতবাদ উল্লেখ করেই কাজ শেষ করেননি। তিনি জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়াও বলে দিয়েছেন। তার এ নীতিগুলো মার্কসীয় শিক্ষাদর্শন গড়ে উঠতে সহায়তা করেছে। মার্কস এবং এঙ্গেলস এ সম্পর্কে চারটি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। নীতিগুলো হলো-

১. মানুষের জ্ঞান আহরণে তার নিজস্ব ভূমিকা থাকা উচিত। এ সক্রিয়তার মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজ প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো।

২. বস্তুজগৎই বাস্তব এবং বস্তুজগৎই প্রকৃত জ্ঞানের সামগ্রী।

৩. মানুষের জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়া জীবনব্যাপী চলতে থাকে।

৪. জানা যায় না- এমন কিছুর অস্তিত্ব বস্তুজগতে নেই।

শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ

শিক্ষা সম্পর্কিত কার্ল মেনহেইমের মতবাদ

কার্ল মেনহেইম তার 'Ideology and Utopia' এবং 'Essays on the Sociology of Knowledge' গ্রন্থে তার জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তবে আমাদের প্রথমেই জেনে রাখা ভালো চিন্তাধারা সম্পর্কিত কার্ল মেইনহেমের সকল দর্শনের মূলে ছিল সামাজিক কাঠামো। তিনি কখনো বিশ্বাস করতেন না যে, চিন্তাধারার উৎপত্তি বিক্ষিপ্ত হতে পারে। বরং তিনি জোর দিয়ে বলেন, প্রতিটি' চিন্তার রীতি কোনো না কোনো সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং কাঠামোর প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ব্যাখ্যা করতে হবে কোনো সমাজের সমষ্টিগত চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে। কারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেমন সমাজবদ্ধ জীবনযাপন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না তেমনি সমাজবদ্ধ কাঠামোর আলোক ছাড়া তার চিন্তাধারার ব্যাখ্যা দেওয়া অমূলক বলেই বিবেচিত হবে। অতএব বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান হচ্ছে সমাজজীবনের সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার একটি অংশ।

শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ

শিক্ষা সম্পর্কিত কার্ল মেনহেইমের মতবাদ

কার্ল মেনহেইম বলেন, "Knowledge is a co-operative process of group life in which everyone unfolds it within a framework of common activity." (জ্ঞান হচ্ছে গোষ্ঠী জীবনের সমন্বিত পদ্ধতি যা প্রত্যেকের সাধারণ কর্মকাণ্ডের কাঠামো উন্মুক্ত করে। যেখানে ব্যক্তি তার নিজস্ব চিন্তাধারা ব্যক্ত করে একটি সমষ্টিগত চিন্তারীতির কাঠামোর আওতায়।) তার বিশ্বাস কোনো মতবাদ এমনকি কোনো বিশ্বাসই তার পারিপার্শ্বিক, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রভাবমূলক হতে পারে না। কাজেই প্রত্যেক স্বতন্ত্র চিন্তাবিদ কোনো না কোনো চিন্তারীতির বলয়ের আওতাভুক্ত- এ বিষয়টিকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে মেনে নেওয়া যায়। এজন্য দেখা যায়, কার্ল মেনহেইম দর্শনে নির্দিষ্ট কোনো সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

কার্ল মেনহেইম প্রণীত শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ হচ্ছে "জ্ঞান-বিজ্ঞান হচ্ছে মূলত অস্তিত্বমূলক নিরূপণ।" তবে এটি অপরিহার্য নয় যে, প্রথাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো আইনের আওতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করবে। কিন্তু বাহ্যিক পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক মতবাদই হচ্ছে এর মূল নিয়ামক। এসব নিয়ামকই আমাদের অভিজ্ঞতা এবং পর্যালোচনার পরিধি এবং মাত্রা নির্ধারণ করে থাকে।

শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ

শিক্ষা সম্পর্কিত কার্ল মেনহেইমের মতবাদ

কার্ল মেনহেইমের মতে, সামাজিক উপাদানসমূহ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাভাবনার মূল চালিকাশক্তি এবং এগুলোই হচ্ছে ধ্যানধারণা নিরূপণকারী বাহ্যিক নিয়ামক। সামাজিক পরিস্থিতির কারণে চিন্তাশীলের ধ্যানধারণার বিষয়বস্তু বৈশিষ্ট্যময় হয় না, বরং সমস্যা নিরূপণের পদ্ধতিও ভিন্নমাত্রার হয়। অতএব বলা যায়, প্রত্যেক চিন্তারীতিই হচ্ছে আদর্শগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। মার্কসের দর্শনে প্রভাবিত হয়ে কার্ল মেনহেইম বলেন, উৎপাদনের উপায়সমূহই হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের নীতিনির্ধারণী শক্তি। তার মতে, "মনোজাগতিক অবকাঠামোর ওপর অবশ্যই সামাজিক অবকাঠামোর প্রভাব রয়েছে।" কাজেই দেখা যাচ্ছে সমাজ, কাঠামো এবং মানুষ এ তিনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে মন থেকে উৎসারিত হওয়া চিন্তাধারা এবং মনের ওপর। প্রত্যেক যুগে রয়েছে স্বতন্ত্র চিন্তাশৈলী। কাজেই কোনো আদর্শ বা মতবাদকে বুঝতে হলে প্রথমেই সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার উৎস সম্পর্কে ধারণা লাভকরতে হবে।

কার্ল মেনহেইমের মতে, 'জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব' হলো রূপায়ণের তত্ত্ব। প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামো এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় সুনির্দিষ্ট অবস্থান রয়েছে। নিরেট ধ্যানমগ্নতা থেকে চিন্তাশীল মানুষ তার পৃথিবীটাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করে না। আবার ব্যক্তি-মানুষের পারিপার্শ্বিক সামাজিক কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীবদ্ধ চিন্তারীতির বিরোধিতাও করে না।

শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ

শিক্ষা সম্পর্কিত কার্ল মেনহেইমের মতবাদ

কার্ল মেনহেইম মনে করেন, জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব বলতে স্বতন্ত্র চিন্তাধারা নিয়ে গবেষণাকে বোঝায় না, বরং তা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট যুগের চিন্তারীতি নিয়ে গবেষণা। এটি হচ্ছে গোষ্ঠীবদ্ধ মনীষী নিয়ে গবেষণা। যেসব মনীষীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বিকশিত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট চিন্তারীতি।

কার্ল মেনহেইম বলেন, এর অর্থ এই নয় যে, স্বতন্ত্র চিন্তাধারা নিয়ে গবেষণার কোনো অবকাশ এখানে নেই। স্বতন্ত্র চিন্তাধারা নিয়ে যুগ যুগ ধরে প্রথাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত সমষ্টিগত চিন্তারীতির আলোকে গবেষণা হতে পারে।

কার্ল মেনহেইম সমস্ত সামাজিক রীতিনীতিকে সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডের প্রভাব বলে উল্লেখ করেন।

সামাজিক প্রক্রিয়ার আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ও কাঠামোগত অবস্থান নিরূপণকে জ্ঞানের ভূমিকা বলা যায়। জ্ঞানের সমাজতত্ত্বে নিজের অবদান আলোচনা করতে গিয়ে কার্ল মেনহেইম বলেন, তিনি সেই অগ্রপথিক যিনি এমন সব দিগন্তের উন্মোচন করেছেন যা অধিকাংশ সচেতন চিন্তাবিদ কৌশলে তা এড়িয়ে গেছেন।'

শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ

শিক্ষা সম্পর্কিত এমিল ডুর্খেইমের মতবাদ

এমিল ডুর্খেইমকে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন বলে বিবেচনা করা হয় যিনি সারাজীবন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। তার মতে, শিক্ষা হচ্ছে একটি সামাজিক বিষয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার অন্তঃসার বা প্রতিপাদ্য নির্ভর করে সমাজের একজন আদর্শ ব্যক্তির ভাবনা বা অভিমতের ওপর। তিনি বলেন, "For each society, education is the means by which it secures, in the children, the essential conditions of its own existence." (প্রত্যেক সমাজের জন্য শিক্ষা হচ্ছে একটি মাধ্যম যা শিশুদের মধ্যে তাদের নিজের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি নিশ্চিত করে।)

শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ

শিক্ষা সম্পর্কিত এমিল ডুর্খেইমের মতবাদ

ডুর্খেইম শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "Education is the influence exercised by adult generations on those that are not yet ready for social life. Its object is to develop in the child a creation number of physical, intellectual and moral states which are demanded of him by both the political society as a whole and the special milieu for which he is specially destined." (শিক্ষা হলো প্রাপ্তবয়স্ক প্রজন্ম কর্তৃক প্রভাব যা সেসব লোকের ওপর খাটানো হয় যারা সামাজিক জীবনের জন্য এখনও প্রস্তুত নয়। এর উদ্দেশ্য হলো শিশুর জন্য সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক সমাজ এবং সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত প্রতিবেশ উভয় দিকের চাহিদা অনুসারে তার মধ্যে নির্দিষ্ট কতকগুলো শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক অবস্থার বিকাশ বা উন্নয়ন সাধন।)

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সামাজিক ব্যবস্থা

টপিক – ১১ ধর্মের ধারণা

ধর্মের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ধর্মের ধারণা

ধর্ম একটি মৌল ও সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ধর্মের অস্তিত্ব নেই অথবা ছিল না এমন কোনো মানবসমাজের কথা সমাজবিজ্ঞানী বা নৃবিজ্ঞানীদের জানা নেই। ধর্ম মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ Religion. এটি Religere শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে বন্ধন। বাংলা 'ধর্ম' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে। ধৃ ধাতু + মন প্রত্যয় = ধর্ম; যার অর্থ হচ্ছে ধারণ করা যা ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে তাকেই বলে ধর্ম। সুতরাং ধর্ম বলতে আমরা এক বিশেষ শক্তিকে বুঝি, যা মানুষের সমগ্র জীবনকে ধারণ করে এবং পরিচালনা করে।

নৃবিজ্ঞানী টেইলর (Tylor) তার Primitive Culture গ্রন্থে বলেন, "Belief in spiritual beings." (ধর্ম হলো আত্মিক জীবে বিশ্বাস।)

সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম (Emile Durkheim) বলেন, "ধর্ম হলো পবিত্র জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাস ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানাদি।"

মনীষী ফ্রেজার (Frazar) বলেন, "ধর্ম হলো মানুষের চেয়ে উচ্চতর এমন একটি শক্তিতে বিশ্বাস? যা মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে।" তার মতে, ধর্মের মূল উপাদান ২টি। যথা- ক. মানুষের চেয়ে উচ্চতর শক্তিতে বিশ্বাস এবং খ. সে শক্তির আরাধনা।

ধর্মের ধারণা

ধর্মের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Religion) : ব্রিটিশ ধর্মতাত্ত্বিক লুইসের (Cliver staples Lewis)-এর মতে, বিশ্বাস, অনুষ্ঠান ও অভিজ্ঞতা একযোগে ধর্মের তিনটি ভিত্তিমূলের মতো। ধর্ম আমাদের মানসিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করে। নিচে ধর্মের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-

" ধর্ম হলো অদৃশ্য এক পরম সত্তায় বিশ্বাস, যিনি সত্য, সুন্দর ও পবিত্রতার প্রতীক।

" ধর্ম হলো অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস ।

" ধর্মবোধ মানুষের আত্মাকে বিশুদ্ধ করে।

" ধর্মবোধ মানুষের নীতিবোধকে উন্নত করে।

" ধর্মভীতি সকল ধরনের পাপকর্ম এবং অন্যান্য অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে ।

" পার্থিব বা অপার্থিক কোনো কিছু পাওয়ার আশায় বা কল্যাণ সাধনের স্বার্থে মানুষ অদৃশ্য শক্তির ওপর নির্ভর করে থাকে।

অতএব, ধর্ম হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং কিছু বিধিবিধান যা মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। ধর্ম মূলত একটি বিশ্বাস। এ বিশ্বাস মানুষের চেয়ে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কেন্দ্র করে। কেবল তাই নয়, ধর্ম বলতে ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।

ধর্মের ধারণা

ধর্মের উৎপত্তি

মানবসমাজে কখন ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। মূলত ধর্মের উৎপত্তির বিষয়টি রহস্যাবৃত। এজন্য সমাজচিন্তাবিদদের ভিতর মতানৈক্য বিদ্যমান। ডেভিড হিউম, ম্যাক্স মূলার এবং গিডিংস দাবি করেন যে, ধর্ম মানুষের সৃষ্টি। এটি অলীক কল্পনার ওপর নির্ভরশীল। অপরপক্ষে, হার্বার্ট স্পেন্সার এবং স্যার ই. বি. টেইলর মনে করেন যে, ধর্ম মূলত ভূত-প্রেতের ভয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রচলিত মতবাদটি হলো সর্বপ্রাণবাদ। এর অর্থ হলো আত্মা ও প্রেতাত্মার প্রতি বিশ্বাস।

টেইলরের মতে, ধর্মের একটি বিবর্তন ধারা রয়েছে। যেমন- প্রথমে সর্বপ্রাণবাদ, তারপর বহু দেবদেবী পূজা এবং সবশেষে এসেছে একেশ্বরবাদ।

অন্যদিকে ম্যারেটের মতে, সর্বপ্রাণবাদের আগে ছিল মহাপ্রাণবাদ, যেখানে 'মনা' নামক নৈর্ব্যক্তিক শক্তিতে বিশ্বাস বিদ্যমান। তার মতে সকল ধর্মের ভিত্তিমূলে এটি কার্যকর।

ধর্মের ধারণা

ধর্মের উৎপত্তি

মানুষ সর্বত্রই এবং সর্বদাই ধর্মের বিকাশ সাধনে ভূমিকা রেখেছে। কারণ এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, কোনো উপজাতি কিংবা নরগোষ্ঠী আছে, যাদের কোনো না কোনো ধরনের ধর্ম ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, মানব প্রকৃতির মধ্যেই ধর্মের উৎপত্তির উৎস নিহিত। কোনো পরিবেশগত ঘটনা কিংবা ঐতিহ্যের শক্তি ধর্মের মতো একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিতে পারে না। ধর্ম অবশ্যই মানবজীবনের সর্বজনীন অভিজ্ঞতা ও এর সার্থক প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে, অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো ধর্ম মানুষের বুদ্ধিগত শক্তির অন্যতম অভিব্যক্তি। মানুষ তার পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া ও তার চাহিদা পূরণের জন্য ধর্মের বিকাশ ঘটায়।

অতএব বলা যায়, ধর্ম মানবজাতির মতোই প্রাচীন। যদি এটি সত্য হয়, তাহলে ধর্মের ঐতিহাসিক উৎপত্তি অন্বেষণ করা অর্থহীন। মূলত সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা তাদের উৎপত্তির দ্বারা বিচার করা সম্ভব নয়। আসলে এসবের আদিতম সামাজিক উৎস আবিষ্কার করা অসম্ভব। যেহেতু প্রতিষ্ঠানসমূহ পাথর নয় যে, খনন করলেই তার চিহ্ন পাওয়া যাবে, সেহেতু ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা কেবলমাত্র কতকগুলো পরোক্ষ সূত্র পেতে পারি। বিবর্তনবাদীদের কল্পনায় কতক অপ্রমাণিত ধারণার সন্ধান পাই।

ধর্মের ধারণা

ধর্মের উৎপত্তি

ডব্লিউ রবার্টসন স্মিথ মনে করেন, মানবসমাজের আদিম ধর্মগুলো কতকগুলো প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি, যেসব ধর্মের ভিত্তি। ডুর্খেইম মোটামুটি এ মত সমর্থন করেন। এছাড়া ডুর্খেইমের বিবেচনায় 'টোটেমবাদ' হচ্ছে ধর্মের উৎপত্তির মূল সূত্র। তিনি তার 'The Elementary Forms of the Religious Life (1912)' নামক গ্রন্থে বলেছেন, স্বয়ং সমাজই হচ্ছে ধর্মের চূড়ান্ত উৎস। এভাবে তিনি ধর্মের উৎপত্তির সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় ব্রতী হন। পক্ষান্তরে, সামনার ও কেলারের মতে, প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের উপযোজনের স্বার্থে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মের উৎপত্তির ক্ষেত্রে দৈবের ভূমিকা রয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মের উৎপত্তির জন্য কোনো একটি বিশেষ কারণ দায়ী নয়। নৈর্ব্যক্তিক শক্তিতে বিশ্বাস, ভয় কিংবা কোনো অনুভূতি থেকে ধর্মের উৎপত্তি ঘটেনি। আসলে ধর্ম মানব-চেতনার মতোই প্রাচীন। এমন কোনো আদিম সমাজ নেই যেখানে কোনো না কোনো ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। ধর্মকে যদি একটি সর্বজনীন প্রপঞ্চ হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাহলে একে মানব চরিত্রের একটি কৃত্রিম পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

ধর্মের ধারণা

ধর্মের উৎপত্তি

ধর্ম অবশ্যই একটি প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। জার্মানির নিয়ান্ডারথাল মানুষের (যারা ২৫,০০০ বছর পূর্বে বাস করত) তাদেরও ধর্ম ছিল। আমাদের জানামতে, সকল প্রাক-অক্ষর সমাজেই ধর্মের অস্তিত্ব ছিল। মানব সংস্কৃতি যেমন প্রাচীন তেমনি ধর্মও একটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। শুধু তাই নয়, এটি একটি বিশেষ ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজবিজ্ঞানে স্বীকৃত অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তির সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মানুষের জৈবিক চাহিদার একটি সম্পর্ক রয়েছে। তবে একথা স্পষ্ট নয় যে, কোনো মানবিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ধর্মের উৎপত্তি নির্ভরশীল।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সামাজিক ব্যবস্থা

টপিক – ১২ নৈতিকতার ধারণা ও প্রভাব

নৈতিকতার ধারণা ও প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

নৈতিকতার ধারণা ও প্রভাব

নৈতিকতার ধারণা

সাধারণ অর্থে নৈতিকতা হলো নীতিমূলক, নীতি সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ কথাবার্তা, আচার-আচরণে নীতির অনুসরণ করাকে নৈতিকতা বলা হয়। নৈতিকতা মূলত একটি সামাজিক ব্যাপার। যে সমাজের বাইরে বাস করে তার কোনো নৈতিকতার প্রয়োজন নেই। তাই নৈতিকতাকে বুঝতে হলে এর সামাজিক প্রেক্ষিতটিকে আগে বুঝতে হবে। সমাজ যেহেতু ব্যক্তির সমষ্টি এবং নৈতিকতা যেহেতু ব্যক্তির ওপরই আরোপ করা হয় সেহেতু নৈতিক ব্যাপারে ব্যক্তির ভূমিকা সম্বন্ধে ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Morality' যা ল্যাট্রিন শব্দ Moralitas শব্দ থেকে উদ্ভব ঘটেছে। ইংরেজিতে যার অর্থ Manner, Character, Proper behaviour অর্থাৎ নৈতিকতা হলো শাব্দিক অর্থে সঠিক আচরণ বা চরিত্র।

সমাজ মানুষের আচার-আচরণ সম্পর্কে তার অনুমোদন কিংবা অননুমোদনকে সাধারণত ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, সঠিক-বেঠিক, সৎ-অসৎ, মূল্যবান-মূল্যহীন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে প্রকাশ করে থাকে। এসব শব্দাবলি এবং তাদের সংযোগে গঠিত বাক্য বা অবধারণের মাধ্যমে মানুষের যে চিন্তাচেতনার প্রকাশ ঘটে তাকে বলা হয় মূল্যবোধ; আর মানুষের এ মূল্যবোধের আরেক নাম হচ্ছে নৈতিকতা।

নৈতিকতার ধারণা ও প্রভাব

নৈতিকতার ধারণা

এমিল ডুর্খেইমের মতে, সমাজবিজ্ঞান হলো নৈতিকতার বিজ্ঞান (A Science of Morality).
নৈতিকতা বলতে আমরা এমন এক আদর্শকে বুঝি, যা নৈতিক অর্থে ভালো বা ন্যায়কে বোঝায়। নৈতিকতা বিকাশের লালনক্ষেত্র হলো সমাজ। নৈতিকতা মূলত ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও পছন্দ থেকে উদ্ভূত। নৈতিকতা অভ্যাস ও চর্চার ব্যাপার এবং এ নৈতিকতা গঠনে ব্যক্তির নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে।
নৈতিকতা বিষয়ক সামাজিক চিন্তাচেতনা যেসব অবধারণের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাদেরকে আমরা এককথায় নৈতিক অবধারণ বা নীতিবাক্য বলতে পারি। এসব নীতিবাক্যগুলো 'চুরি করা অন্যায়', 'মিথ্যা বলা ভালো নয়' ইত্যাদি আকারে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি।

নৈতিকতার ধারণা ও প্রভাব

সমাজজীবনে নৈতিকতার প্রভাব

সাম্প্রতিক সময়কালে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি যেমন একদিকে দ্রুতগতিতে চলছে, অপরদিকে তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হচ্ছে। বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষীকরণের (Specialization) ওপর এতই গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে যে, এর ফলে এসব ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, এটি ঠিকই, তবে প্রজ্ঞা বাড়েনি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অচিন্তনীয় উন্নতি সত্ত্বেও মানবসভ্যতা আজ নৈতিকতার অভাবে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে মানুষের উগ্র বস্তুবাদী মনোভাবের মধ্যে যদি সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের পরম আদর্শ রূপায়িত না হয়, তাহলে মানুষের সত্যিকার জীবনের উচ্চতর মূল্য ও পরম আদর্শের অভাবে সমাজে নৈতিকতার সঙ্কট দেখা দেবে। পক্ষান্তরে, নৈতিকতার প্রভাবে সমাজ হয়ে উঠবে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। সমাজজীবনে নৈতিকতার প্রভাবে ব্যক্তির চরিত্র গঠন হবে এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে।

পরিবার হচ্ছে নৈতিকতা শিক্ষার প্রাথমিক লালন ক্ষেত্র। পরিবারে নৈতিকতার অভাব দেখা দিলে শিশু নৈতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ করার পরিবর্তে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পন্থাকেই বেছে নেবে। শিশু নানা রকম অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়বে, সমাজে কিশোর অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে, পরিবারে নৈতিকতার অনুশীলন শিশুকে সুপথে পরিচালিত করবে এবং শিশু একজন আদর্শ মানুষে পরিণত হবে। অর্থাৎ পরিবারে নৈতিকতার অনুশীলন শিশুর সামাজিকীকরণে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে।

নৈতিকতার ধারণা ও প্রভাব

সমাজজীবনে নৈতিকতার প্রভাব

বর্তমানে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রদর্শিত অশালীন দৃশ্য এবং বাজারে সস্তায় প্রাপ্ত অশ্লীল ম্যাগাজিন ও পুস্তকের মাধ্যমে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ এমনভাবে ঘটেছে যে, সেগুলো কিশোর-কিশোরীদের সুকুমার মনোবৃত্তিকে ধ্বংস করছে। সমাজে নৈতিকতার বিস্তার ঘটলে এসব অপসংস্কৃতি রোধ করা সম্ভব হবে এবং সমাজে সুস্থ ধারার চর্চা বেড়ে যাবে। ফলে সমাজের বিশেষ করে কিশোর অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পাবে।

নৈতিকতাবোধের অভাবে আমাদের সমাজে আজ দুর্নীতির ব্যাপকতা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা গোটা সমাজকে, রাষ্ট্রকে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত করছে। সমাজে নৈতিকতার বিস্তার ঘটলে বা ব্যক্তি নৈতিকতার অনুসরণ করলে সে সবরকম দুর্নীতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। দুর্নীতি বিলুপ্তির মাধ্যমে সমাজে অভাবনীয় আর্থসামাজিক সাফল্য অর্জিত হবে। সমাজ হয়ে উঠবে শান্তিময়। রাষ্ট্র পরিচিতি লাভ করবে সবচেয়ে কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে।

নৈতিকতার ধারণা ও প্রভাব

সমাজজীবনে নৈতিকতার প্রভাব

সন্ত্রাস আমাদের সমাজের একটি অন্যতম সমস্যা। নৈতিকতার অভাবে সমাজে সন্ত্রাস বিস্তার লাভ করে। সমাজে নৈতিকতার বিস্তার ঘটলে এবং সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে অনুশীলন করলে সেখানে সন্ত্রাস বহুলাংশে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

পুরাতন খারাপ সামাজিক মূল্যবোধের জায়গায় নতুন সামাজিক মূল্যবোধের আবির্ভাব ঘটুক, এতে কারও আপত্তি নেই, কিন্তু তা গ্রহণ করার পূর্বে আমাদের একটু যাচাই করে নেওয়া দরকার, তা নৈতিক দিক থেকে ভালো কিনা, বা মানবকল্যাণমুখী কিনা বা সমাজের জন্য মঙ্গলজনক কিনা? আর যদি তাই করা হয় তাহলে নতুন সামাজিক মূল্যবোধ গোটা সমাজের কল্যাণ বয়ে আনবে। সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ হবে। পক্ষান্তরে, এর বিপরীত অবস্থা সমাজে অনৈতিকতার বিস্তার ঘটিয়ে সমাজকে কলুষিত করে তুলবে।

নৈতিকতার ধারণা ও প্রভাব

সমাজজীবনে নৈতিকতার প্রভাব

নৈতিকতার অনুশীলন সামাজিক বৈষম্য রোধে সহায়ক। আমাদের সমাজে যেসব সামাজিক বৈষম্য বা অসমতা রয়েছে, নৈতিকতা সেসব বৈষম্য বা অসমতা দূর করতে সক্ষম। যেমন- লিঙ্গ বৈষম্য, বয়স বৈষম্য ইত্যাদি। এছাড়া সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসেবে নৈতিকতার প্রভাব অপরিসীম। নৈতিকতা সমাজে প্রচলিত সমস্যা যেমন- যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন, পতিতাবৃত্তি, অশ্লীলতা ইত্যাদি প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং সমাজে নৈতিকতার অনুশীলন দরকার।

নৈতিকতার ধারণা ও প্রভাব

সমাজজীবনে নৈতিকতার প্রভাব

নৈতিকতা রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, শ্রেণিস্বার্থের দ্বন্দ্ব, আইনগত বিধানের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি রাজনৈতিক ও আইনগত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি নিরসন করতে পারে। সুষ্ঠু নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির অনুশীলনকল্পে নৈতিকতার বিকল্প নেই। নৈতিকতার প্রভাবে সমাজ বা রাষ্ট্রের অস্থিরতা দূর হয়। অ্যারিস্টটল তার 'দি নিকোম্যাকিয়ান এথিকস' গ্রন্থে যা বলেছেন তার সারকথা হলো, "রাষ্ট্রের অভিজ্ঞ ও নৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা নৈতিক সূত্রাবলির ওপর ভিত্তি করে প্রণীত শাসনতন্ত্র অনুসরণ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের শাসনকার্যের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ যদি নৈতিকতা পালনে যথার্থ ভূমিকা পালন করেন, তাহলে কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যেখানে প্রতিটি নাগরিক সদগুণ ও শান্তির সুস্বাদ পেতে পারে। পক্ষান্তরে, কোনো রাষ্ট্রের বা দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ও রাষ্ট্রের শাসনকার্যের সঙ্গে জড়িত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সুনীতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে কোনো পদস্খলন ঘটলে তা স্বাভাবিকভাবে সেই রাষ্ট্র বা দেশের সাধারণ মানুষের জীবনধারাকে দুর্বিষহ করে তোলে।

নৈতিকতার ধারণা ও প্রভাব

সমাজজীবনে নৈতিকতার প্রভাব

নিঃস্বার্থ, হিংসাবিহীন দেশপ্রেমই স্বদেশপ্রেম। নৈতিকতা থেকে উৎসারিত একটি গুণ হলো স্বদেশপ্রেম। নৈতিকতা স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করে। যে জাতির নৈতিকতাবোধ, আত্মসম্ভ্রমবোধ যত প্রখর, সে জাতির স্বদেশপ্রেম তত প্রবল। চরিত্র মানে স্বধর্ম। কোনো লোকের বিশেষ আচরণ বৈশিষ্ট্যকে চরিত্র বলা হয়। চরিত্র বলতে যে ধারণা বোঝায় তাতে আছে
কতকগুলো গুণের সমাবেশ। নৈতিকতা মানব চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া নৈতিকতাবোধ সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা আনয়ন করে। সর্বোপরি সামাজিক জীবনে নৈতিকতার প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। সুতরাং আমাদের জীবনে নৈতিকতার চর্চা অপরিহার্য।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সামাজিক ব্যবস্থা

টপিক – ১৩ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মিরাজ সাহেব 'ক' নামক দেশের একজন মন্ত্রী। কাইয়ুম সাহেব সেই রাষ্ট্রেরই একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। কাইয়ুম সাহেব মনে করেন রাষ্ট্র একদিনে হঠাৎ করে তৈরি হয়নি। সময়ের প্রয়োজনে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

[ঢা. বো. '১৮; য. বো. '১৮, সি. বো. '১৮; দি. বো. '১৮]

ক. ক্ষমতা কী?

খ. সম্পত্তি বলতে কী বোঝ?

গ. মিরাজ সাহেব রাষ্ট্রের কোন উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "কাইয়ুম সাহেবের বক্তব্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তির সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতবাদ"- বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

জনাব কলিম উদ্দিন একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী।
ব্যবসার উন্নয়ন তার মূল ভাবনা। তিনি পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পক্ষে। কেননা তিনি মনে করেন অন্যান্য অর্থব্যবস্থা যেমন মিশ্র অবস্থা, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার চেয়ে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ব্যবসার জন্য বেশি অনুকূল। এতে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।
[ঢা. বো.'১৭; য. বো. '১৭; কু. বো. '১৭; চ. বো. '১৭; সি. বো. '১৭; দি. বো. '১৭]
ক. রুশোর মতে, প্রকৃতির রাজ্য কেমন ছিল?
খ. সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে কী বোঝায়?
গ. জনাব কলিম উদ্দিন কেন পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পক্ষে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'সমাজতান্ত্রিক অবস্থার চেয়ে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ব্যবসার জন্য বেশি অনুকূল।'- তুমি কি এ কথার সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

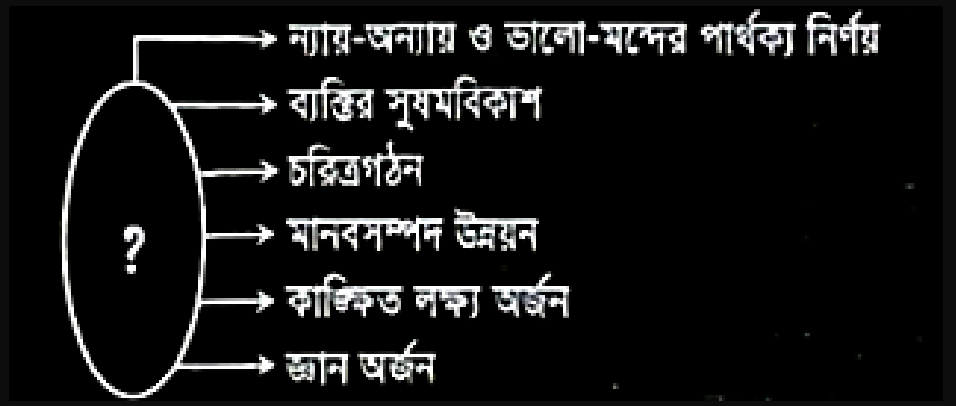

[সকল বোর্ড ২০১৬]

ক. "মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের আবিষ্কারই হলো শিক্ষা।"-উক্তিটি কার?

খ. জেন্ডার ধারণাটি বর্তমান সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ- ব্যাখ্যা কর।

গ. '?' চিহ্নিত স্থানে কী হবে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উক্ত বিষয়টিই জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ"-বিশ্লেষণ কর।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সামাজিক ব্যবস্থা

টপিক – ১৪ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. পুঁজিবাদের অপর নাম কী?

ক. ধনতন্ত্র খ. সমাজতন্ত্র গ. সম্পদবাদ ঘ. অর্থবাদ

২.উৎপাদন উপকরণে ব্যক্তি মালিকানা থাকে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়?

ক. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা খ. মিশ্র অর্থব্যবস্থা

গ. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ঘ. ইসলামি অর্থব্যবস্থা

৩. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি কী?

ক. রাষ্ট্রীয় মালিকানা খ. সুষম বণ্টন

গ. অবাধ প্রতিযোগিতা ঘ. সেবামূলক কার্যক্রম

৪. পুঁজিবাদে কার স্বার্থ উপেক্ষিত হয়?

ক. মালিকের খ. ভোক্তার গ. ব্যবসায়ীর ঘ. শ্রমিকের

৫.সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা কাকে বলে?

ক. যেখানে সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে

খ. যেখানে সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে

গ. যেখানে সম্পদের ওপর দ্বৈত মালিকানা থাকে

ঘ. যেখানে সম্পদের ওপর পারিবারিক মালিকানা থাকে

৬.ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এমন ব্যবস্থা যেখানে-
i. যাবতীয় সম্পদ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় ii. ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে
iii. যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি বেসরকারি উদ্যোগে সংগঠিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭.পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হলো-
i. সমাজে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়া ii. রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার উপস্থিতি
iii. রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অনুপস্থিতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮.সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলতে যা বোঝায়-
i. সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা ii. সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা
iii. অর্থনৈতিক কার্যক্রম কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের
মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৯ ও ১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মেহেদি হাসান মীরপুর শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে একজন বিদেশী বন্ধুর সাথে পরিচিত হয়। যার দেশের যাবতীয় সম্পদ এবং উৎপাদনের উপকরণের ওপর সামাজিক মালিকানা স্বীকৃত। এমনকি সে দেশের কারখানা, খনি, জমি প্রভৃতি সামাজিক সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়।

৯.মেহেদির বিদেশী বন্ধুর দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান?

ক. পুঁজিবাদী খ. সমাজতান্ত্রিক গ. ইসলামি ঘ. মিশ্র

১০. এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়-

i. ভোক্তার স্বাধীনতা স্বীকৃত নয়

ii. ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত

iii. রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১১. মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানার পাশাপাশি কোন মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে?

ক. সরকারি মালিকানা
খ. পারিবারিক মালিকানা
গ. বৈদেশিক মালিকানা
ঘ. যৌথ মালিকানা

১২. মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক. ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সরকারি উদ্যোগের সমন্বয়হীনতা
খ. ব্যক্তিগত খাতে অধিক প্রাধান্য
গ. সরকারি খাতে অধিক প্রাধান্য
ঘ. ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগের সহাবস্থান

১৩. কোনটি সরকারি মালিকানায় থাকে?

ক. ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান
খ. মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান
গ. ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান
ঘ. কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান

THANK YOU